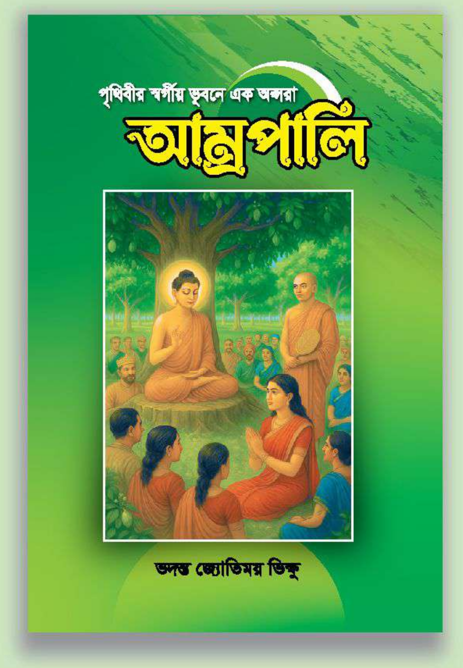

বৌদ্ধ শাস্ত্রে গ্রন্থধুর ও বিদর্শনধুর রয়েছে। ত্রিপিটক এবং তত্ত্ব তথ্যপূর্ণ পঠনপাঠন পরিযত্তি শিক্ষারই অন্তর্গত। ঋদ্ধ পঠনপাঠন এক সময় কলমের ডগায় বেরিয়ে এসে সাহিত্য সৃষ্টি হয়। অনুসন্ধিৎসু মননশীলতা নিয়েই ভদন্ত জ্যোতিময় ভিক্ষুর অপূর্ব সৃষ্টি "পৃথিবীর স্বর্গীয় ভুবনে এক অপ্সরা আম্রপালি" গ্রন্থটি। তারুণ্যের শক্তি অথচ তাঁর মাতৃভাষা বাংলা নয় তবুও দূরত্ব ঘুচিয়ে বাংলায় জীবনী সাহিত্যভাণ্ডারে একটা অমূল্য রত্ন দান করলেন। যা বাংলা ভাষার প্রতি সবিশেষ নিপুণতারই পরিচায়ক। তাঁর এমন-তরো বৌদ্ধ সাহিত্যচর্চা অব্যাহত থেকে দুর্বোধ্যকে সুবোধ্য, জটিলকে প্রাঞ্জল এবং গভীর তত্ত্বকে সরস ও সাবলীল করে বুদ্ধের পরিভাষায় ধর্মদান সকল দানকে জয় করে এই মহত্ত্বতায় যাপিত হউক গৈরিক জীবন। কয়েকটি বিহারে অবস্থানের সময়েও তাঁর বিনয়সম্মত জীবন, নির্ভেজাল, মিষ্টভাষিতা, অল্পেতুষ্ট, জানার, অনুসন্ধানের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ভিক্ষু জীবনকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনুপম করেছেন। অনাগারিক জীবনে বিশুদ্ধ অপূর্ব চারিত্রিক মহিমায় চিরোজ্জ্বল থেকে দুঃখ অন্তসাধনের নিজেকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করে ষোলকলা পরিপূর্ণ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অপরূপ বেশে বুদ্ধপুত্র জীবন শোভমান মহিমান্বিত হউক এই প্রত্যাশা করছি।

ইতি-

শ্রীমৎ উপেক্ষাবংশ ভিক্ষ

অন্তেবাসীঃ মহামুনি অরণ্য বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র
মহামুনি পাহাড়তলী, রাউজান, চট্টগ্রাম।

শব্দশিল্প
Amrapali by
Bhadanta Jyotimoy Bhikkhu
ISBN: 978-984-93167-1-8

পৃথিবীর স্বর্গীয় ভুবনে এক অপ্সরা আম্রপালি ভদন্ত জ্যোতিময় ভিক্ষু

পৃথিবীর স্বর্গীয় ভুবনে এক অপ্সরা

আম্রপালি

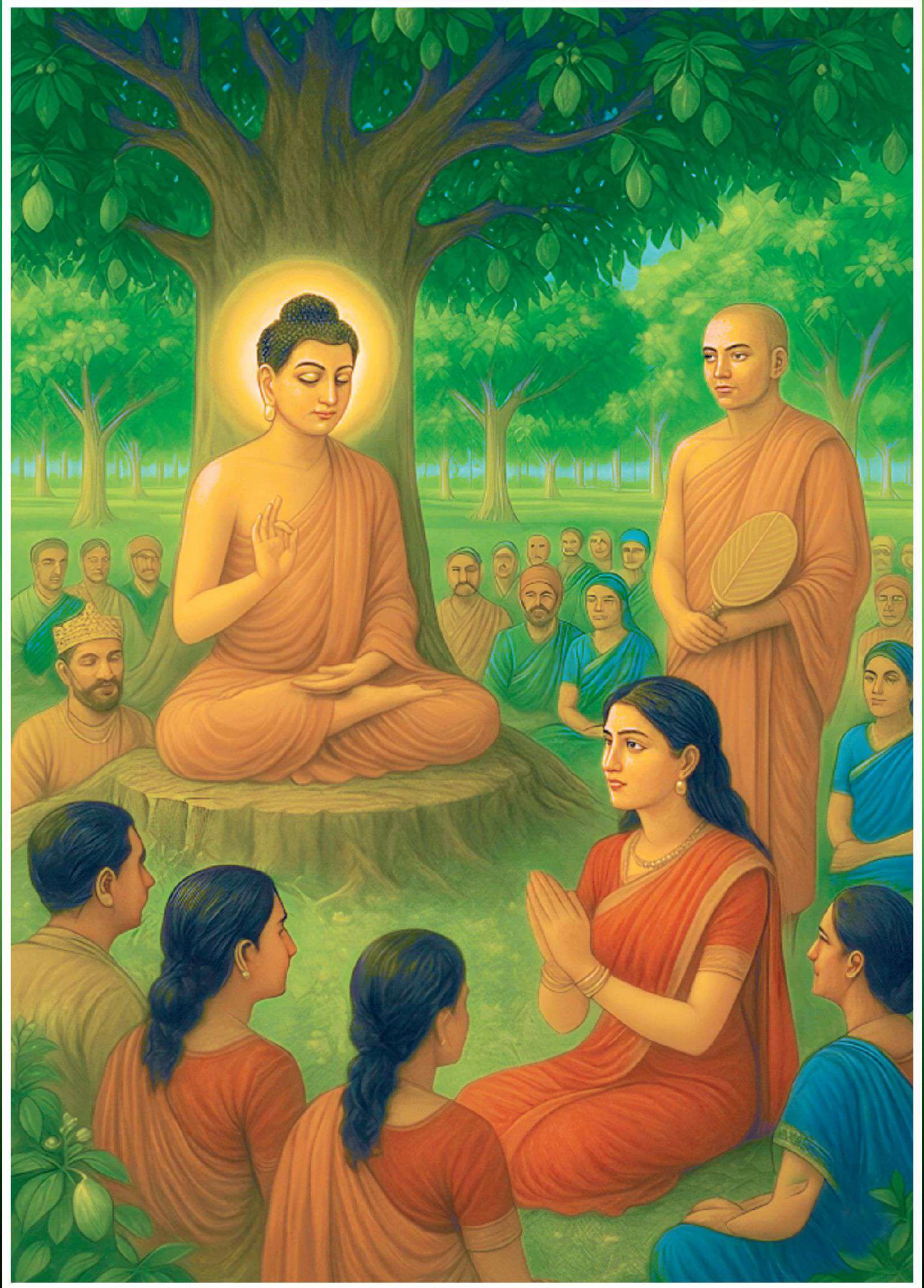

ভদন্ত জ্যোতিময় ভিক্ষু

গ্রন্থকারের পরিচিতিঃ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রাম এতে শঙ্খ, কর্ণ, মাতামুহুরী, চেঙ্গী, মায়ানী, কাচালং নদী প্রবাহকে ঘিরে অসংখ্য ছোট বড় পাহাড়, সবুজ বন-বনানী আর পাহাড়ীঝর্ণায় পরিবেষ্টিত। চেঙ্গী, মায়ানী প্রভৃতি খাগড়াছড়ি জেলাটিতে প্রবাহিত। এই জেলারই অন্তর্গত লক্ষীছড়ি উপলোর গরগয্যাছড়ি গ্রামে ১৯৯৩ সালে উপাসক মরত্তুয়া চাকমা এবং উপাসিকা প্রদী মালা চাকমার কোল আলোকিত করে জন্মগ্রহণ করেন ভদন্ত জ্যোতিময় ভিক্ষু। সমতলের মতোই পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৮৬৪ সালে থেরবাদের আদর্শের উদ্ভব ঘটে। সাদামাটা পরিবারের আদর্শিক এবং ত্রিরত্নের পূজারী হিসেবেই বেড়ে উঠেন তিনি। এক সময় অতীত পুণ্য হেতুতে চিত্ত 'বিরাগ সেট্‌ঠো ধম্ম' বিরাগই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বিরাগময় পূতচরিত্রে অঙ্কুরোদগম হয়। সংসার পিঞ্জর থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাঁর প্রাণ আকুল হয়ে পড়ে। ১৭/০১/২০১২ সালে, মঙ্গলবার, ভদন্ত দেবমিত্র মহাস্থবির এর নিকট এক শুভক্ষণে প্রবজ্যা গ্রহণ করেন। মহামান্য ত্রয়োদশ সংঘরাজ ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির এর শিষ্য বিনাজুরী বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারের তৎকালীন অধ্যক্ষ ভদন্ত বিমলজ্যোতি স্থবির নিকটই প্রাথমিক শ্রামণ্য শিক্ষাসহ বিনয়াচারাদি শিক্ষাগ্রহণ করেন। দীর্ঘ সাত বছর শ্রামণ্য জীবন কাটিয়ে ১৭/১১/২০১৮ সালে পূর্ব বিনাজুরী রত্নাংকুর বিহারের পাষাণ সীমায় উপসংঘরাজ ভদন্ত প্রিয়দর্শী মহাস্থবির এর উপাধ্যায়ত্বে এবং ধর্মজ্যোতি ভিক্ষুর আচার্যত্বে উপসম্পদা গ্রহণ করেন।

পৃথিবীর স্বর্গীয় ভুবনে এক অপ্সরা

আম্রপালি

ভদন্ত জ্যোতিময় ভিক্ষু

শব্দশিল্প

পৃথিবীর স্বর্গীয় ভুবনে এক অপ্সরা

আম্রপালি

ভদন্ত জ্যোতিময় ভিক্ষু

প্রকাশকাল:
মার্চ ২০২৬

গ্রন্থস্বত্ব:
ভদন্ত জ্যোতিময় ভিক্ষু

প্রকাশক:
দিবশন বিকাশ বড়ুয়া
নমিতা রাণী বড়ুয়া

প্রচ্ছদ:
রকি বড়ুয়া

কম্পোজ:
রিয়াদুস ছালেহীন (রিয়াদ)

ডিজাইন ও মুদ্রণ:
শব্দশিল্প
৬ জিএ ভবন, ৪ তলা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
০১৮১৯-৮১৮৯১৬, ০১৯৫৭-৬৭৭৭৮৩
shobdoshilpo.ctg@gmail.com
ISBN: 978-984-93167-1-8

উৎসর্গ

দিবশন বিকাশ বড়ুয়া
(বীর মুক্তিযোদ্ধা,
জুনি. অব. সেনা ওয়ারেন্ট অফিসার)

পৃথিবীর স্বর্গীয় ভুবনে এক অপ্সরা আম্রপালি গ্রন্থটি প্রকাশকের দায়িত্ব নিতে পারায় আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। এই পুণ্যময় কাজটির মাধ্যমে যত পুণ্য অর্জিত হয়েছে বা হবে সব পুণ্যটুকু আমাদের পরপারগত জ্ঞাতী-যাদের স্নেহ, ভালোবাসা, ত্যাগ তিতিক্ষায় আমাদের জীবন ধন্য, এ দুর্লভ মানবজীবনে ধর্মদান ও পুণ্যদান ব্যতিত যাঁদের ঋণ অপরিশোধনীয়, সেই হিতকামী পরম কল্যাণমিত্র আমারই পিতা স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র বড়ুয়া ও মাতা স্বর্গীয়া বরদা রাণী বড়ুয়া এবং শ্বশুর স্বর্গীয় হরিমোহন বড়ুয়া ও শ্বাশুড়ি স্বর্গীয়া প্রিয়রমা বড়ুয়া ও জ্ঞাতিগণসহ সকল প্রাণীর হিতসুখ মঙ্গল কামনায় পুণ্যদান করছি।

পরিশেষে পুত্র, কন্যা, পুত্রবধুসহ ও পরিবারের সকলের হিত-সুখ মঙ্গল কামনা করে, তাদের জীবনে উন্নতি ও সুখ সমৃদ্ধি লাভ হোক এ প্রত্যাশায় পুণ্যদান করছি।

দিবশন বিকাশ বড়ুয়া
(বীর মুক্তিযোদ্ধা, জুনি. অব. সেনা ওয়ারেন্ট অফিসার)
সহধর্মিণী নমিতা রাণী বড়ুয়া

নমিতা রাণী বড়ুয়া

উৎসর্গ পত্র

প্রব্রজ্জিত জীবনে আলো দিশারি মদীয় গুরুদেব পরম পূজনীয় প্রয়াত বিমলজ্যোতি থের ও গুরু ভান্তে প্রয়াত হওয়ার পর, যাকে সুখে দুঃখে পাশে পেয়েছিলাম সবসময়; যিনি আপন না হয়েও আমাকে আপন ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ মমতা দিয়ে গেছেন; আপন বড় ভাইয়ের সমতুল্য এবং ভিক্ষুত্ব জীবনের আচার্য পূজনীয় ধর্মজ্যোতি ভিক্ষুর নিরোগ ও সুস্থজীবন কামনা করছি। সে সাথে আমার জন্মদাতা ব্রহ্মতুল্য পিতা-মাতার নিরোগ ও দীর্ঘজীবন কামনায় পুণ্যদান করে আমার সাহিত্য জীবনে সূচনা প্রথম গ্রন্থখানি উৎসর্গ করলাম।

গ্রন্থকার

গ্রন্থকারের নিবেদন

পৃথিবীর স্বর্গীয় ভুবনে এক অপ্সরা আম্রপালি এই গ্রন্থটি রচনার মূলে রয়েছে উপাসিকা জিংকি বড়ুয়ার একটি বিশেষ অনুরোধ। একদিন সংঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডল ধর্মায়তন শিক্ষার্থীদের থের-থেরিদের জীবনী পড়ানোর সময় তিনি আমাকে এই মহীয়সীদের জীবন নিয়ে ধর্মদেশনা করার অনুরোধ করেন। সেই ভাবনা থেকেই পাঠকদের জন্য একজন থেরির জীবনলেখ্য রচনার সংকল্প করি। অনেক গবেষণার পর আমি বৈশালীর আম্রপালিকে বেছে নিই। কারণ তাঁর জীবন বিচিত্র ও শিক্ষণীয়। বর্তমানে আম্রপালিকে নিয়ে প্রচলিত অনেক নাটক, সিনেমা বা উপন্যাসে তথ্যের বিকৃতি ঘটেছে (যেমন: তাঁর পুত্রকে ভুলভাবে উপস্থাপন)। সত্যকে তুলে ধরতেই আমি মূল ত্রিপিটক, থেরিগাথা, থেরি অপদান ও অর্টঠকথা অনুসরণ করে এই জীবনীটি সাজিয়েছি।

আম্রপালি এই গ্রন্থটি কাহিনী দ্বারা লিপিবদ্ধ হলেও মূলত মূল নির্যাসটি পাবেন বুদ্ধের চার আর্যসত্যকে ঘিরে, এই গ্রন্থে দান, শীল, ভাবনা ও শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, দুঃখ-কষ্ট ও নির্বাণ সবকিছু এক ঝুড়িতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

বইটি প্রকাশের পেছনে বিশেষ অবদান রেখেছেন নিশ্চিন্তাপুর-নানুপুর শীলালংকার শান্তিধাম বিহারের সভাপতি বাবু দিবশন বিকাশ বড়ুয়া মহোদয় ও তাঁর পরিবারবর্গ। আমি একটি গ্রন্থ রচনার কাজ আরম্ভ করেছি এ বিষয়টি অবগত হলে তিনি প্রকাশকের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বলে আমাকে জানালেন। অবশেষে ওনার শাসন দরদী মনমানসিকতার মধ্য দিয়ে আম্রপালি বইটি পাঠক মহলের কাছে প্রকাশ হতে যাচ্ছে।

এ মহৎ কর্মদীপ্ত মন নিয়ে প্রকাশকের দায়িত্ব গ্রহণ করায় উপাসকের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। এছাড়া আরও এ পুণ্যময় কাজে সাহায্য করেছেন ভদন্ত উপেক্ষা বংশ ভিক্ষু, স্মৃতি বংশ থের, নিশ্চিন্তাপুর-নানুপুর শীলালংকার শান্তিধাম বিহারের সাধারণ সম্পাদক রাজীব বড়ুয়া শিবু, প্রচ্ছদে- রকি বড়ুয়া, শব্দশিল্পের স্বত্বাধিকারী মুহাম্মদ আরমান ভাই ও রিয়াদুস ছালেহীন (রিয়াদ) নানুপুর ভিক্ষুসংঘ ও সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থটি নির্ভুল করার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখিনি। জানি তারপরও ভুলভ্রান্তি লুকিয়ে থাকবে, পাঠক মহল গ্রন্থটি পাঠ করার সময় ভুলভ্রান্তির সম্মুখীন হলে মার্জনা করবেন। আর গঠনমূলক সমালোচনা ও সঠিক পরামর্শ দিতে ভুলবেন না, এসব সাদরে গ্রহণ করা হবে। নিচে ওয়াটসাপ নাম্বার দিয়ে দিলাম, যদি প্রয়োজন হয় বা কোন কিছু না বুঝলে ছবি তুলে ওয়াটসাপ দিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারবেন, তবে অযথা কল গ্রহণ করা হবেনা। আম্রপালি গ্রন্থটি যদি পাঠকদের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে, তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

জয় হোক বুদ্ধের শাসন

গ্রন্থকার

ওয়াটসাপ: ০১৯০৩৭-৩৮২২০

২৭. ০২. ২০২৬

ভূমিকা

আম্রপালি বৌদ্ধ সাহিত্য প্রেমীদের কাছে অতি জনপ্রিয় একজন নগর নন্দিনীর (অভিজাত বারবণিতা) উপখ্যান। বুদ্ধ সমকালে খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে মধ্য ভারতের মগধ অঞ্চলের বৈশালী নামক এক গণতান্ত্রিক রাজ্যের রাজা মহারাজাদের মনোরঞ্জনকারী রাজ্যের অদ্বিতীয়া সেরা সুন্দরী ছিলেন এই আম্রপালি। কথিত আছে, তাঁর তাক লাগানো রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রতিবেশী বহু রাজারা যুদ্ধ করে হলেও তাকে নিজের অধিকারে নিতে উদ্যত হয়েছিলেন। রক্তক্ষয়ী সংঘাত এড়াতেই নাকি সবাই সম্মত হলেন তাকে কেবলমাত্র অভিজাতগণের উপভোগ্য করতে নগরবধু রূপে বরণ করার।

অলৌকিক সৌন্দর্য তার জন্যে এভাবেই কাল হয়ে গেলো কেন?

এই আক্ষেপ জড়িত প্রশ্নের জবাবে নানান কাহিনী জুড়ে দিয়েছেন বৌদ্ধ সাহিত্য চর্চাকারীগণ। বিশেষ করে বুদ্ধ শিক্ষার বহির্ভূত জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসীদের মতে অতীতে সিখী বুদ্ধের সময়ে তিনি এক আর্যমার্গ লাভীকে ঘৃণাবশে বেশ্যা বলার অপরাধে অভিশপ্ত হয়েছিলেন। তাই তিনি নিজেও সেই পর্যায়ের অভিশপ্ত জীবন গ্রহণে বাধ্য হলেন।

আমার প্রশ্ন হলো, একজন পুরুষ একাধিক নারীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক যেখানে দোষণীয় নহে; সেক্ষেত্রে একজন নারী একাধিক পুরুষের সাথে দৈহিক সম্পর্ক দোষণীয় হবে কেন? আর দেহকে আশ্রয় করেই তো সকলে আপন জীবন-জীবিকার উপায় করতে হয়। কৃষিকর্ম বলুন বা ব্যবসা বলুন, লেখাপড়া বলুন বা চাকরি বলুন; জীবন জীবিকার সব উপায় তো করতে হয়; দেহটিকে ভিত্তি করেই। তাই দেহ তো সেসকল ক্ষেত্রে জীবন-জীবিকার অন্যতম মাধ্যম। একজন মহিলার দেহ ব্যবসায় তাহলে এতো নিন্দনীয়, জঘন্য বিবেচিত হয় কোন যুক্তিতে? অথচ মানব সভ্যতার ইতিহাসে এভাবে দেহকে পণ্য করার প্রথা সুপ্রাচীনকালের। নারী পুরুষের প্রকৃতিগত জৈবিক চাহিদা পূরণেই নগরনন্দিনী নামক প্রথাটির আবির্ভাব।

বৌদ্ধ সাহিত্যেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার এমন অনৈতিক মানসিকতাকে সবিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে প্রায় সর্বত্র। অথচ বুদ্ধের শিক্ষা চারি আর্যসত্যজ্ঞান কখনো তা সমর্থন করে না। বুদ্ধের এই শিক্ষায় পরিষ্কারভাবে বলা আছে; দুঃখ নামক অনুভূতিটি প্রাণীমাত্রেই কাহারো আদরণীয় নহে; অভিনন্দন যোগ্য নহে। তাই প্রাণী হিসেবে এই দুঃখ হতে পুরুষ যেমন মুক্তি চাহে, নারীও তেমনটি চাহে। আর সেই কারণেই দুঃখ মুক্তির উপায়ও কিন্তু নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্যে এক ও অভিন্ন। আর একারণেই বুদ্ধের সংঘের সভ্যপদ লাভে নারী পুরুষ উভয়কে সমান অধিকার দিয়েছেন।

তৎকালীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় মনুস্মৃতি নামক একটি শাস্ত্রের আলোকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সুদ্র নামে যেই অনৈতিক, অমানবিক বর্ণবাদ প্রথার জন্মদিয়েছিলেন; বুদ্ধ ছিলেন তার ঘোর বিরোধী।

বুদ্ধ তাই উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন–

"ন যস্স বসলো হোতি;
ন যস্স হোতি ব্রহ্মণো।
কম্মুন বসলো হোতি;
কম্মুন হোতি ব্রহ্মণো।"

বাংলাঃ

জন্মে নহে হীন কেহ;
জন্মে উত্তম নয়।
নিজ কর্মেই হীন-উত্তম;
কর্মে পরিচয়।

নিজ কর্মের এই পরম স্বীকৃতি বুদ্ধ কেবল জন্ম বিচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন-নি তিনি বিশ্ব-চরাচরের অপরিবর্তনীয় অনিত্য অবিরাম বহমান পরিবর্তনশীল স্বভাবকে গভীরভাবে অনুধাবন করেই উচ্চারণ করেছেন

"অনিচ্চা বত সঙ্খারা;
উপ্পদা বয় ধম্মিনো।"

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান সব কিছুই আদি অন্তহীন উৎপত্তি আর বিলয়ের মহাস্রোতের অংশ হয়ে কেবল ছুটে চলেছে। সৃষ্টি আর ধ্বংসের এই মহাজাগতিক স্বভাব বুঝতে অক্ষম হয়েই প্রাণীরা নিজেকে কেবল আজীবন সুখী দেখতে চায়। তাই সে সারাক্ষণ দুঃখের বিরোধিতা করে করে কেবল সুখের পেছনে দৌড়ায়। এই অজ্ঞতা, মোহগ্রস্ততাই তাকে মৃত্যু পর্যন্ত দুঃখের শিকারে পরিণত করে থাকে।

বুদ্ধের চারি আর্যসত্যজ্ঞানের তাই মূল বক্তব্য হলো দেহধারীর জীবনে দুঃখ যে অনতিক্রম্য এক স্বভাব ধর্ম; এই চিরসত্যটি সর্বাগ্রে স্বীকার করে না । তারপরে, যখন যেই দুঃখটি তীব্র হয়ে অনুভূত হয়, তার কারণ সন্ধানে গভীর ধ্যানময় একাগ্র মনের জন্ম দাও। সেই একাগ্র মনেই নির্ভূল হয়ে ধরা পড়বে দুঃখটার প্রকৃত কারণ। দুঃখের কারণটা এভাবে চিহ্নিত করার পর, তার থেকে মুক্ত হতে যথাযত উদ্যম পরাক্রম করো। সেই সঠিক প্রচেষ্টা টি হবে "আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের" আটটি শর্ত জীবন চলার পথে অনুশীলন করা। তাতেই জীবনটা হয়ে উঠবে এক অবর্ণনীয় আনন্দময়। বুদ্ধ সেই পরমানন্দময় জীবনের নাম দিয়েছেন "নিব্বাণং পরমং সুখং।"

ইহাই বুদ্ধের শিক্ষা উপদেশের মূল বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধশিক্ষার এই আহ্বানের বাইরে

বুদ্ধ অনুরাগী অনুসারীরা আর যা কিছু করছেন বা করবেন; মনে রাখা দরকার; এগুলো হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম বা সাহিত্য।

আম্রপালি নামক বুদ্ধকালীন এই প্রখ্যাত মহিলার ভোগবিলাস বহুল জীবন বুদ্ধ শিক্ষার আলোয় একসময় মনেপ্রাণে পরিত্যক্ত হয়ে তিনি শরণ নিয়েছিলেন বুদ্ধের ভিক্ষুণী সংঘে। সেই জীবনেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন জীবনের প্রকৃত সুখ, প্রকৃত শান্তি। তাই তিনি পরিচিতি পেয়েছিলেন অরহত থেরি আম্রপালি নামে।

আম্রপালির জীবনকাহিনী উপস্থাপন করতে গিয়ে বর্তমান গ্রন্থকার মহোদয় ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভাবিত বৌদ্ধ পালি সাহিত্যের গতানুগতিক ধারাই অনুসরণ করেছেন। পালি সাহিত্য হতে বাংলা ভাষায় এযাবৎ তাঁদের সবগুলো সেই পালি সাহিত্যের ধারাকে অনুসরণ করে অনুদিত হয়েছে। সেই পালি সাহিত্য বলতে পিটকীয় গ্রন্থসমূহ এবং তাদের ভাষ্যগ্রন্থ অট্ঠকথা, টিকা, অনুটিকা নামক গ্রন্থগুলো। আম্রপালি নামক বর্তমান গ্রন্থটির মূল উৎস পালি সুত্তপিটকের খুদ্দক নিকায় ভুক্ত থেরিগাথা নামক গ্রন্থ এবং তার ভাষ্যগ্রন্থ তথা অট্ঠকথা অবলম্বনে রচিত।

গল্পকাহিনীর চাহিদা সাধারণ পাঠক সমাজে চিরকালীন। আশাকরি এই গ্রন্থের আকর্ষণও তেমন হবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধর্ম দর্শনের মূল উদ্দেশ্য সাধারণ শ্রোতা ও পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করতে গল্পের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধ সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

আশাকরি, আম্রপালি গ্রন্থের পাঠকগণ এই গল্প পাঠ করার সময়ে বুদ্ধ শিক্ষা চারি আর্যসত্যের অনুকূলে যা কিছু আছে সেগুলো যত্ন-সহকারে বুঝতে সচেষ্ট থাকবেন। তাতেই পাঠকগণ লাভবান হবেন।

ভবতু সব্ব মঙ্গলম!
প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো;
বুদ্ধগয়া প্রজ্ঞাবিহার; ফ্রান্স।
২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ।

সূচিপত্র

বোধিসত্ত্ব নিদান ও বোধিসত্ত্বগণের অলঙ্ঘনীয় ধর্মতা	১১-১৮
ধরাধামে এক শান্তসূর্যের আগমন ও তাহার করুণ বিদায়	১৯-২৬
অন্তর্জগতে বেড়ে ওঠা বিশাল এক অগ্নির খনি	২৭-৩৬
তিরোকুড্ড সূত্র বাংলা	৩৭-৩৯
মানবের মাঝে দেবলোক বৈশালীনগরের করুণ দৃশ্য	৪০-৪৯
জগতে (বিশ্ব) সর্বপ্রথম গণতন্ত্রের উৎপত্তি	৫০-৫২
গণতন্ত্রের ৭টি গোপন কথা	৫৩-৫৪
আম্রপালির অতীত কর্মফলের অমোঘ এক বিধানের ধারা	৫৫-৫৭
ভাবী আম্রপালির বিচিত্র জীবনের গোপন রহস্য	৫৮-৬৩
বৈশালীনগর ও প্রাচীন এক জাতির উদয় ও তার প্রাচীন ইতিহাস	৬৪-৭৪
বৈশালির রাজ উদ্যানে রহস্যময় এক কন্যা শিশু	৭৫-৮১
মগধরাজ বিম্বিসারের সাথে আম্রপালির গোপন প্রণয়	৮২-৮৬
আম্রপালির পুত্র বিমল কৌণ্ডিন্য সে কি তার পিতাকে খুঁজে পাবে	৮৭-৯৩
বুদ্ধের করুণায় গণিকা থেকে নির্বাণের পথে	৯৪-৯৯
এক মহাজালের বাধন মুক্তি	১০০-১০৬
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	১০৭-১০৮
উপসংহার	১০৯-১১০
বইয়ের ভেতরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীর ছবি	১১১-১২০

অভিমত

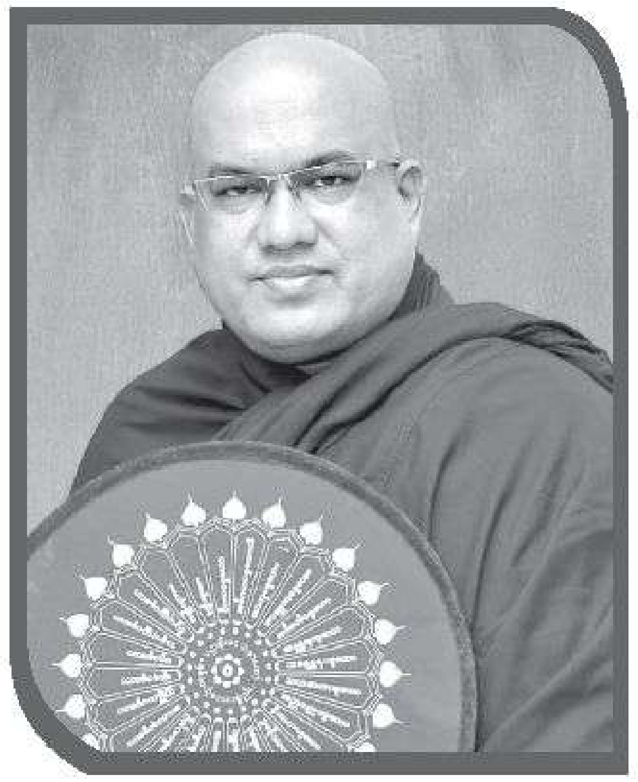

পৃথিবীর স্বর্গীয় ভুবনে এক অপ্সরা আম্রপালি নামক একটি গ্রন্থ প্রিয়ভাজন জ্যোতিময় ভিক্ষু সংকলন করতে যাচ্ছে, জেনে আমি খুবই আনন্দিত হলাম।

আম্রপালির জীবন পরিচিতি কাহিনী পাওয়া যায় ত্রিপিটকের সুত্তপিটক খুদ্দকনিকায় গ্রন্থ থেরিগাথা থেরি অপদান ও অট্ঠকথা এসব গ্রন্থে। আম্রপালি বৈশালীর নগরবধূ নামে পরিচিত। বৈশালীনগরের দন্ধ নিবারণার্থে তাকে নগরগণিকা করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে বুদ্ধের ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তিনি সত্ত্বগণের উদয়-ব্যয়শীলতাকে উপলব্দি করে ভিক্ষুণীধর্মে প্রবেশ করে অচিরেই অরহত হতে সক্ষম হন।

প্রিয়ভাজন জ্যোতিময় ভিক্ষু বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তকাদি পঠনপাঠন করে, সেখান থেকে নির্যাস সংগ্রহ করে 'আম্রপালি' জীবন পরিচিতিমূলক এ গ্রন্থটি সংকলন করেছে। পঠনপাঠনের ধ্যান-জ্ঞান দিয়ে নতুন আর একটি গ্রন্থ সৃষ্টি করা সত্যি দুরূহ একটি কাজ। চিন্তাশীল ধ্যান-জ্ঞান মননে প্রতীভাবাপন্ন মননশীলতা না থাকলে একাজ করা সম্ভব নয়। ধর্মীয় পুস্তক অধ্যয়নের অভ্যাস জিজ্ঞাসু মনের অনেক বিষয় সমাধান করে। কারণ অধীত জ্ঞান না থাকলে কোন বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা যায় না। আশারাখি প্রিয়ভাজন জ্যোতিময় ভিক্ষু কর্তৃক সংকলিত এ গ্রন্থটি অতীত বুদ্ধগণের জীবন ও আম্রপালি সর্ম্পকে অনেক কিছু জানা যাবে। আমি তার সুস্বাস্থ্য ধর্মময় জীবন কামনা এবং তার সংকলিত গ্রন্থটি বহুল প্রচার কামনা করছি।

কর্মযোগী বিপুলবংশ মহাস্থবির
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, সংঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডল ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদ
বিহারাধ্যক্ষ, বায়েজিত থানা কেন্দ্রীয় শান্তিকুঞ্জ বিহার, চট্টগ্রাম মহানগর

বোধিসত্ত্ব নিদান ও বোধিসত্ত্বগণের অলঙ্ঘনীয় ধর্মতা

সেই অনেক অনেক কাল আগের কথা, আজ থেকে প্রায় বিরানব্বই কল্প পূর্বের ঘটনা বর্তমান ভারতবর্ষ বা উপমহাদেশের এই জম্বুদ্বীপই ছিল পৃথিবীর মানব সভ্যতার মূল কেন্দ্র। এই দ্বীপ ছাড়া অন্য কোথাও বুদ্ধগণ জন্মগ্রহণ করেন না। তাই জম্বুদ্বীপ হলো জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জন্মস্থান। মানুষ থেকে শুরু করে দেব-ব্রহ্মাগণ সবাই এই পবিত্র ভূমিকে ভীষণ ভালোবাসেন। জগতের যত সম্যক সম্বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ এবং রাজচক্রবর্তী রাজা এসেছেন, তারা সবাই এই জম্বুদ্বীপেই জন্মগ্রহণ করেছেন। জগতের সকল প্রাণীর দুঃখ মুক্তির জন্য 'চারি আর্যসত্যের' বাণী এই দ্বীপ থেকেই প্রচার করা হয়। তাই জম্বুদ্বীপকে পৃথিবীর 'নাভিস্থল' বললেও ভুল হবে না।

সেই সময় জম্বুদ্বীপকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল স্বর্গীয় নন্দনকাননের মতো এক সুন্দর শহর, যার নাম কাসিকনগর। ঐতিহ্যবাহী ও সৌভাগ্যবতী এই নগরটি গঙ্গা নদীর কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছিল। মা গঙ্গার শীতল বাতাস এমন শান্তিময় ছিল যে, সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি শেষে সন্ধ্যায় তার ছোঁয়া পেলেই শরীর ও মন তাজা হয়ে যেত।

শহরটি সবসময় সবুজ গাছপালা আর ফসলে ভরা থাকত। সেখানে সবসময় আনন্দ-উৎসব চলত খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান আর বীণা-মৃদঙ্গের সুরে পুরো নগর মুখরিত থাকত। হাতি-ঘোড়ার ডাক আর কোকিলের মিষ্টি গানের মতো মধুর ধ্বনি সবসময় কানে আসত। নানা রঙের ফুল আর ফলের সুমিষ্ট গন্ধে পুরো শহর ম ম করত। মনে হতো যেন এক মা তার প্রিয় সন্তানকে আদর আর চুম্বনে আগলে রেখেছেন। প্রকৃতি যেন সেখানে স্বর্গের লীলাখেলা সাজিয়ে রেখেছে।

করুণাময় রাজা জয়সেন আর মমতাময়ী রানি সিরিমা এই শহরটিকে এমন অপূর্বভাবে সাজিয়েছিলেন যে, মনে হতো যেন স্বর্গের কারিগর বিশ্বকর্মা নিজে তা তৈরি করেছেন। রাজা-রানি, মন্ত্রী, সৈন্য এবং সাধারণ প্রজা সবাই ছিলেন ধর্মপ্রাণ। তারা সবাই 'পঞ্চশীলে' বিশ্বাসী ছিলেন এবং মন খুলে দান-ধর্ম করতেন

রাজার সুশাসনে সেখানে কোনো অভাব-অভিযোগ ছিল না। চুরি, ডাকাতি, হত্যা কিংবা নেশা ও মিথ্যা বলার মতো কোনো পাপ সেখানে ছিল না। সবার মনে ছিল শুধু দয়া, মায়া আর ভালোবাসা। রাজ্যের মানুষ এত সুখে বাস করতেন যে, তা ভাবাই যায় না। একারণেই সেইকালের জ্ঞানী-পণ্ডিতরা এই রাজ্যের নাম দিয়েছিলেন'স্বর্গের লীলাক্ষেত্র নন্দকাননের পুণ্যভূমি সৌভাগ্যবতী কাসিকনগর'।

ব্যাখ্যা :
মানসসরোবর থেকে গঙ্গানদীর উৎপত্তি। গঙ্গানদী থেকে আরও অনেক নদী উৎপত্তি হয়ে নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে চাষবাসের উপযোগী করে তুলেছে।

প্রাচীন কাসিকনগরে শুভ ও মঙ্গলময় কর্মের প্রচলন থাকলেও তৎকালীন সময়ে সামগ্রিক সমাজব্যবস্থায় সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল না। সেই সময়ে প্রমূখ ধর্মগুরুরা নানাধরনের মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন। যে মতবাদগুলো সাধারণ মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তৎকালীন সময়ের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থাকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি।
যেমন:

১। বলিপ্রথা ও অন্ধবিশ্বাস :
অনেক ধর্মগুরু প্রচার করতেন যে, নর-বলি বা পশু-বলি দিলে দেবতারা সন্তুষ্ট হন। তাদের মতে এই ধরনের প্রকৃতির বিরুদ্ধ কর্মের মাধ্যমেই বা এরকম বিসর্জনের মাধ্যমেই দেব-দেবীরা খুশি হয়ে মানুষকে রোগ-ব্যাধি এবং অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা করেন।

২। কঠোর কৃচ্ছসাধন ও যোগ-সাধনা:
কিছু সন্ন্যাসী মনে করতেন, কঠোর যোগ-সাধনার মাধ্যমে আত্মমুক্তি সম্ভব এই সাধনা ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও বেদনাদায়ক, যা মূলত ছিল শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনেরই লীলাখেলা। তৎকালীন সময়ে এই 'কৃচ্ছসাধনা' করা সন্ন্যাসীদের অনুসারী বা শিষ্যসংখ্যার পরিমাণ শত শত ছিল ।

৩। গঙ্গাস্নান ও প্রকৃতি পূজা:
ভোরবেলায় গঙ্গাস্নানের মাধ্যমে সারাদিনের কৃত পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় বলে অনেকের বিশ্বাস ছিল। তাদের এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে আমার ব্যক্তিগত জীবনের উপলব্দিকৃত থেকে একটি ধারণা দেওয়া যাকঃ আমরা সাধারণত মানুষেরা বিভিন্ন কাজকর্মের দ্বারা জীবনধারণ করে থাকি। কেউ কৃষিকাজে, কেউ ব্যবসায়, কেউ চাকরিতে, কেউ শিক্ষায়, এভাবে যার যেরকম পেশা তিনি সারাদিন সেই পেশায় ব্যস্ত থাকেন এর ফলে এই কাজগুলো করতে করতে আমাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। তারা তখন চায় শুধু বিশ্রাম। এভাবে আমরা যখন ঘুম যায় রাত্রে, এই ঘুমের সময়কালে শরীর আবার তার জীবনী শক্তি ফিরে পায়। এজন্যেই আমরা যখন সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠি তখন মনে হয় শরীরটা হালকা হয়ে গেছে। আর ঘুম থেকে উঠার পর যদি সকালবেলায় স্নান সেড়ে নিতে পারি, তাহলে আর কিছু বলার থাকে না। সেদিন নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে হয়। মনের মধ্যে এক ঝলক আনন্দের শিহরণ অনুভূত হয়। আমার মনে হয় প্রাচীন সন্নাসীরা ও এই অনুভূতিকে অনুভব করতেন বলে তারা বিশ্বাস করেন ভোরবেলার গঙ্গাস্নানই পাপক্ষয়ের কারণ। সূর্য এই পৃথিবীকে আলো দেয়। গাছ ফুল-ফল দেয়। গঙ্গার পানি দ্বারা মানুষ গৃহকর্ম থেকে শুরু করে ফসল উৎপাদনীয় কর্মগুলো করতে পারে। তখন সন্ন্যাসীরা মনে

করত এসব কিছু দেবতাদের দেয়া দানের ফল। তাঁরা এসব কিছু না দিলে আমরা এসব পেতাম না, ফলে বেঁচে থাকাও কঠিন হয়ে যেত। এসব বিশ্বাস ছিল বলে তাই তারা প্রকৃতি পূজা করত।

৪। শিক্ষা ও প্রকৃত সত্যের অভাব:

প্রাচীন সময়ে দানশীল এবং ভাবনার চর্চা একেবারেই ছিল না তা নয়, তবে সেখানে কিছু মৌলিক শিক্ষা ও সত্যতার অভাব ছিল। যেমন:

(ক) উপযুক্ত নৈতিক শিক্ষা ও পঞ্চশীলের সঠিক জ্ঞানের অভাব।

(খ) দানের প্রকৃত ক্ষেত্র (ভিক্ষুসংঘ) ও মুক্তির সঠিক পথ বা চার আর্যসত্যের শিক্ষার অভাব।

(গ) সম্পূর্ণ তৃষ্ণা ক্ষয় করার এবং এই কাজটি কিভাবে করতে হয় এই শিক্ষাটির অভাব। সেই সময়ে বিভিন্ন মতবাদের প্রভাবেই মানুষ এত তাই বিভ্রান্তিতে পড়ে ছিলেন তা বুঝানো যাবে না।

এই বিভ্রান্তিকর ও দুঃখময় সময়ে, ফুস্য বুদ্ধাংকুর (বোধিসত্ত্ব) চার অসংখ্য কল্পকাল ধরে পারমী, উপ-পারমী ও পরমার্থ পারমী ভেদে মোট ৩০ প্রকার পারমী পূর্ণ করার পর পরিশেষে উৎপন্ন হলেন তুষিত স্বর্গে।

ফুস্য বোধিসত্ত্ব তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হওয়ার পর দিব্য সুখ উপভোগ করতে লাগলেন। তিনি দীর্ঘ সময় দিব্যসুখ উপভোগ করতে করতে তার আয়ুক্ষয়ের শেষের দিকে পৃথিবীতে একটি কোলাহল দেখা দিল। ফুস্য বোধিসত্ত্ব যে, বুদ্ধ হবেন এই বিষয়টি ব্রহ্মলোকের আভাস্বর ব্রহ্মারা বুঝতে পেরে তারা দিকে দিকে প্রচার করতে লাগলেন পৃথিবীতে একজন মহাপুরুষ উৎপন্ন হবেন। তিনি উৎপন্ন হয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞানী বুদ্ধ হয়ে জগতকে আলোকিত করবেন। তাদের এই ভবিষ্যৎ বাণী মানুষেরা শ্রবণ করে এতই উচ্চস্বরে প্রচার করতে লাগল যে, তখন তাদের এই উচ্চশব্দ ভূমিবাসী দেবগণের আবাসস্থলকে কম্পিত করে দিল। অতঃপর-ভূমিকাবাসী দেবতারাও উচ্চশব্দে প্রচার করতে লাগল।

তখন নিম্নস্তরের দেবতা থেকে শুরু করে উচ্চস্তরের দেবতা ও ব্রহ্মারাও প্রচার করতে লাগলেন– জগতে বুদ্ধ আবির্ভূত হবেন। এভাবে বুদ্ধ কোলাহল দীর্ঘসময় প্রচাররত থাকার পর একদিন দশ সহস্র বা দশ হাজার চক্রবালের দেব-ব্রহ্মাগণ দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে একত্রিত হলেন। তারা দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে গিয়ে বলতে লাগলেন প্রভু পৃথিবীর ভুবন থেকে শুরু করে সমগ্র দশ হাজার চক্রবালের সমস্ত সত্ত্বগণ বুদ্ধকে কামনা করছেন।

দশহাজার চক্রবালের দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করে দেবরাজ ইন্দ্র তার সামন্ত চক্ষু প্রচারিত করে দেখতে লাগলেন কোন সত্ত্ব বুদ্ধ হওয়ার জন্য উপযুক্ত। দেবরাজ ইন্দ্র সমস্ত ত্রিভুবন অবলোকন করার পর কেবল একজনকেই দেখতে পেলেন বুদ্ধ হওয়ার উপযুক্ত বলে। দেবরাজ ইন্দ্র

আবার দেখলেন সেই সত্ত্ব এখন কোথায় অবস্থান করছেন? তিনি দেখতে পেলেন পুন্যবান বা পারমীবান সত্ত্বটি এখন তুষিত স্বর্গে অবস্থান করছেন। তারপর দেবরাজ ইন্দ্র-চারিলোকপাল রক্ষাকারী দেব-রাজাদেরসহ দশহাজার চক্রবালের দেব-ব্রহ্মাগণের রাজাদের আহ্বান করলেন। বন্ধুগণ অমুক সত্ত্ব বুদ্ধ হবেন। তিনি এখন তুষিত স্বর্গে অবস্থান করছেন। বন্ধুগণ চলুন আমরা তার কাছে উপস্থিত হয়ে সকলে-সম্মিলিতভাবে বুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করি বা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের জন্য আহ্বান করি।

তারপর দেবরাজ ইন্দ্রসহ এককে লোকের রক্ষাকারী দেবগণ তথা দশ হাজার চক্রবালের দেবগণ সম্মিলিতভাবে ফুস্য বোধিসত্ত্ব তুষিত স্বর্গে যেই বিমানে অবস্থান করতেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত সকলে হাত জোড় করে প্রার্থনা করলেন, হে-মারিষ! তুমি যে অসংখ্য কল্পকাল ধরে যেই দশ পারমী পূর্ণ করেছ, তা বুদ্ধ হয়ে সর্বজ্ঞ জ্ঞানলাভের জন্যই পূর্ণ করেছ। কোনো ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্র, মার, কিংবা চক্রবর্তী সম্পত্তি লাভের জন্য নয়।

হে মারিষ! তুমি যার জন্য দশবিধ পারমী পূর্ণ করেছ তা লাভ করার এখন সময় হয়েছে। বুদ্ধত্ব বা সর্বজ্ঞ জ্ঞান লাভ করার এখনই উপযুক্ত সময়। যাও- মারিষ! পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে বুদ্ধ হয়ে জগৎ উদ্ধার করুন। দেবগণের এই প্রার্থনায় ফুস্য বোধিসত্ত্ব চিন্তা করলেন বুদ্ধ হওয়ার জন্য এখন উপযুক্ত সময় কিনা। তিনি দেখলেন বুদ্ধ হওয়ার জন্য এখনই উপযুক্ত সময়।

তারপর ফুস্য বোধিসত্ত্ব আবার পাঁচটি বিষয় দেখে নিলেন সেগুলো লাভের সময় কিনা। যথা– কাল বা সময়, দ্বীপ, দেশ, কুল ও মাতার আয়ুষ্কাল।

১। কাল- উপযুক্ত সময়ে না হলে সত্ত্বগণ শ্রদ্ধা উৎপন্ন করতে পারেন না। অর্থাৎ মানুষের এক লক্ষ বছরের অধিক আয়ুষ্কালকে উপযুক্ত সময় বলা যায় না, তখন ধর্মদেশনা করলে সত্ত্বগণ বা প্রাণীগণ জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু/অনিত্য দুঃখ ও অনাত্ম এই ত্রি-লক্ষণযুক্ত জ্ঞান উপলব্দি করতে পারেন না, বুঝতে পারেন না। বুদ্ধগণের ধর্মদেশনা অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম এই ত্রি-লক্ষণকে ঘিরেই হয়ে থাকে। এই অধিক আয়ুষ্কাল সময়ে প্রাণীগণকে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম এই তিনটি বিষয়ে ধর্মদেশনা করলে- প্রাণীগণের বুঝার ও উপলব্দি করার ক্ষমতা না থাকায়- বুঝতে না পেরে তখন বুদ্ধকে হেয় প্রতিপন্ন করেন। তিরষ্কার করে থাকেন।

প্রাণীগণ তখন বলেন– ইনি এইসব কী বলছেন? জগতের সমস্ত বস্তু নাকী- উদয়-ব্যয়শীল? এইভাবে সত্ত্বগণ বুদ্ধের কথাগুলো গুরুত্ব দিতে পারে না বলে ধর্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না তার জন্য এসময়ে বুদ্ধগণের উৎপত্তিকে অকাল বলা হয়েছে।

আবার শত বছরের কম আয়ুসম্পন্ন স্বত্তগণও ধর্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না। তাই এই সময়কেও বুদ্ধগণের উৎপত্তির অকাল বলা হয়েছে। কেননা শত বছরের কম আয়ুসম্পন্ন সত্ত্বগণের বা মানুষের মন লোভ, দ্বেষ, মোহে ভরপুর থাকে। এই সময় মানুষ ভালো-মন্দ বিচার করতে পারে না। তাদের অন্তরের সত্যজ্ঞানের বিবেকবোধ তখন লুপ্ত হয়। এই সময়ের অর্থাৎ শত বছরের কম আয়ুসম্পন্ন মানুষেরা নিজেদের স্বার্থ হাসিল করাকেই প্রকৃত সত্য বলে মনে করে। এজন্য এসময়ে বুদ্ধগণের ধর্মদেশনা কার্যকারিতা লাভ করে না। উপরে একলক্ষ বছর এবং নিচে একশত বছর আয়ুসম্পন্ন সত্ত্বগণের (মানুষের) জীবিত সময়কেই বুদ্ধগণের উৎপত্তির উপযুক্ত কাল বা সময় বলা হয়। এই সময়ে শতকরা ৯০% মানুষ বা প্রাণী বুদ্ধের ধর্মজ্ঞান-ধর্মদেশনা উপলব্ধি করতে পারে, বুঝতে পারে। ফুস্য বোধিসত্ত্বও দেখলেন বুদ্ধ হওয়ার এখন উপযুক্ত সময় হয়েছে। তখন মানুষের আয়ু লক্ষ বছর ছিল।

২। এরপর ফুস্য বোধিসত্ত্ব দ্বীপ বা মহাদেশগুলো দেখতে লাগলেন। তিনি দেখলেন- ছোট ছোট দ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পৃথিবীতে চারটি মহাদ্বীপ রয়েছে। চারটি মহাদ্বীপসমূহ যথাক্রমে: পূর্বদিকে-পূর্ববিদেহ মহাদ্বীপ, দক্ষিণ দিকে-জম্বুদ্বীপ অর্থাৎ মনুষ্যলোক, পশ্চিমদিকে-অপরগোয়ান মহাদ্বীপ, উত্তর-দিকে-উত্তরকুরু মহাদ্বীপ।

(ক) পূর্ববিদেহ মহাদ্বীপের সত্ত্বগণের আয়ু ৫০০ (পাঁচশত) বছর। (জগতের ধর্মানুসারে এই দ্বীপের সত্ত্বগণের আয়ু নির্দিষ্ট, এর চেয়ে বাড়েও না এবং কমেও না)

(খ) দক্ষিণদিকে জম্বুদ্বীপের বা মনুষ্যলোকের আয়ু অনির্দিষ্ট। মনুষ্যদের আয়ু সর্বোচ্চ লক্ষ বছরের অধিক হতে পারে এবং সর্বনিম্ন ১০ বছরে নেমে আসে, মানুষের আয়ু উপরে-নিচে ওঠা নামা করে বলে এই দ্বীপের সত্ত্বগণের আয়ু অনির্দিষ্ট।

(গ) পশ্চিমদিকে অপরগোয়ান দ্বীপের সত্ত্বগণের আয়ু পাঁচশত (৫০০) বছর। এই দ্বীপের সত্ত্বগণের আয়ুও নির্দিষ্ট।

(ঘ) উত্তরদিকের উত্তরকুরুদ্বীপের সত্ত্বগণের আয়ু এক হাজার (১০০০) বছর। এই দ্বীপের সত্ত্বগণের আয়ুও নির্দিষ্ট।

তারপর ফুস্য বোধিসত্ত্ব দেখতে পেলেন- পূর্ববিদেহ, অপরগোয়ানও উত্তরকুরু এই তিনটি দ্বীপে বুদ্ধগণ উৎপন্ন হন না। এই দ্বীপসমূহে সত্ত্বগণ পঞ্চকামগুণসমূহ দেবলোকের- দেবগণের ন্যায় উপভোগ করে থাকেন। কোনো দুঃখদুর্দশা তাদের পরিলক্ষিত হয় না। কেবল পুণ্যফলই তারা ভোগ করেন। এইজন্যই এই তিনটি দ্বীপে বুদ্ধগণের উৎপত্তি হওয়ার কোনো নিয়ম নেই। তিনি দেখলেন কেবল জম্বুদ্বীপেই বুদ্ধগণ উৎপত্তি হয়ে থাকেন। এই দ্বীপের সত্ত্বগণের মধ্যে

সুখ-দুঃখ বিদ্যমান তাই তারা ধর্মজ্ঞান উপলব্দি করতে পারেন।

এমনকি পৃথিবীতে যত বুদ্ধ উৎপত্তি হয়েছেন তারা প্রত্যেকেই এই জম্বুদ্বীপেই উৎপন্ন হয়েছেন অন্যকোন দ্বীপে নয়। এটাই বুদ্ধগণের জন্মগ্রহণের পর্যায়ক্রমিক ধর্মতা বা নীতি। (দীর্ঘনিকায়-মহাপদান সূত্র-অট্‌ঠকথা ও টীকা)

৩। এরপর ফুস্য বোধিসত্ত্ব দেখলেন জম্বুদ্বীপের মধ্য কোন দেশে বুদ্ধগণ জন্মগ্রহণ করে থাকেন। তিনি দেখলেন একমাত্র মধ্য প্রদেশেই বা মধ্যদেশেই বুদ্ধগণ জন্ম নেন। এই মধ্যপ্রদেশই হচ্ছে বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ, অগ্রশ্রাবক-মহা শ্রাবক, অগ্রশ্রাবীকা-মহাশ্রাবীকা, চক্রবর্তীরাজা, ক্ষত্রীয়, ব্রাহ্মণ, শ্রেষ্ঠী, মহাশ্রেষ্ঠী, আরও যত ক্ষমতাবান-ক্ষমতাশালী সত্ত্ব বা মানুষ (ব্যক্তি) আছেন তারা প্রত্যেকেই এই মধ্যপ্রদেশেই জন্মগ্রহণ করেন অন্যকোনো দেশে নয়।

৪। তারপর ফুস্য বোধিসত্ত্ব গভীরভাবে চিন্তা করলেন কোন বংশে বা কোন পরিবারে তাঁর জন্ম নেওয়া উচিত?

তিনি দেখলেন, জগতের বুদ্ধগণ সবসময় ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। কারণ এই দুই বংশের মানুষরা জ্ঞানী, গুণী এবং সবার কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। বুদ্ধগণ যখন পৃথিবীতে আসার প্রস্তুতি নেন, তখন জম্বুদ্বীপের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ এই দুই শ্রেণির আধিপত্য থাকে আকাশচুম্বী। তাঁদের প্রভাব ও সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণগুলো ছিল: সে সময় সমাজে ক্ষত্রিয় (শাসক ও যোদ্ধা) এবং ব্রাহ্মণ (জ্ঞানী ও শিক্ষক) এই দুই কুলকে সবচেয়ে পবিত্র ও উচ্চবংশীয় মনে করা হতো। সাধারণ মানুষ তাঁদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করত। জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন এবং শাস্ত্রীয় বিদ্যায় এই দুই বংশের মানুষেরা ছিলেন সবার চেয়ে এগিয়ে। তাঁদের বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা ছিল সবার উপরে। দেশ পরিচালনা, বিচারব্যবস্থা এবং সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়দের শাসন ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁদের বীরত্ব ও ন্যায়পরায়ণতার খ্যাতি দেশ-বিদেশে সমাদৃত হতো।

মানুষের মনে বিশ্বাস ছিল যে, এই উচ্চবংশীয় মহৎ ব্যক্তিদের মাধ্যমেই জগতের কল্যাণ হওয়া সম্ভব। এই দুই কুল বাদে অন্যান্যরা যে ক্ষমতালাভের অযোগ্য ছিল তা নয়। তাদের ও ক্ষমতা ছিল কিন্তু এই দুই কুল তাদেরকে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত রাখত। আর ঠিক এই কারণেই বোধিসত্ত্বগণ পৃথিবীতে আসার জন্য সবসময় এমন পরিবারকেই বেছে নিতেন, যারা আগে থেকেই লোকসমাজে বিশ্বাসযোগ্য ও গুণের আধার হিসেবে পরিচিত।

এর ফলে মানুষ খাদ্য শস্য-শ্যামলা উৎপাদন করে জীবনধারণ করে এসছেন যুগ-যুগান্তর ধরে। তাই এখানে আমি এই গঙ্গানদীকে মা-জননী বলে সম্বোধন করেছি।

তাই ফুস্য বোধিসত্ত্ব সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনিও ক্ষত্রিয় বংশেই জন্ম নেবেন। কারণ তৎকালীন সময়ে ক্ষত্রিদের আদিপত্য ছিল। বোধিসত্ত্ব এবার খুঁজতে শুরু করলেন তাঁর যোগ্য মাতা-পিতা কারা হতে পারেন। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন: ভারতের মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত সুন্দর ও সমৃদ্ধ কাশি নগরী। কাশি নগরের প্রজাপালক ও ন্যায়পরায়ণ রাজা জয়সেন। রাজমহিষী এবং পরম রূপবতী ও গুণবতী ক্ষত্রিয়কন্যা সিরিমা।

রাজা জয়সেন ও রাণী সিরিমা সাধারণ কোনো দম্পতি নয়। তাঁরা দীর্ঘ এক লক্ষ কল্পকাল ধরে পারমী পূরণ করেছিলেন। তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল কোনো এক বুদ্ধের মাতা-পিতা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করা।

তাঁদের এই অসীম ধৈর্য, পারমী এবং ত্যাগ দেখে ফুস্য বোধিসত্ত্ব নিশ্চিত হলেন যে, এই মহৎ দম্পতিই তাঁর মতো মাতা-পিতা হওয়ার জন্য সবচেয়ে যোগ্য।

৫। এরপর ফুস্য বোধিসত্ত্ব দেখতে লাগলেন বুদ্ধগণের মাতারা কেমন চরিত্র সম্পন্ন হন এবং তারা কতদিন জীবিত থাকেন। তিনি দেখলেন বুদ্ধগণের মাতারা লোভ, দ্বেষ, ও মোহসম্পন্ন হন না। তারা জন্ম থেকেই সর্বদা পঞ্চশীল পালন করে থাকেন। তাঁরা জীবনের বিনিময়েও পঞ্চশীল লঙ্গন করেন না। তাঁরা ভদ্র, নম্র ও শান্ত স্বভাবের হয়ে থাকেন। তারা বুদ্ধের মাতা হওয়ার জন্য বুদ্ধগণের কাছ থেকে যেদিনই আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন সেদিন থেকে লক্ষ কল্পকাল পর্যন্ত একদিনও পঞ্চশীল ভঙ্গ করেন না। ফুস্য বোধিসত্ত্ব উপরের সকল গুণগুলো সিরিমার মধ্যে দেখতে পেলেন। তারপর আবার দেখলেন-রাণী সিরিমা আর কতদিন বাঁচবেন। ফুস্য বোধিসত্ত্ব দেখতে পেলেন তিনি আরও দশমাস বোধিসত্ত্বকে গর্ভধারণ করে বুদ্ধাংকুর (বোধিসত্ত্ব) ভূমিষ্ট হওয়ার সাতদিন পরেই পরলোকগত হবেন। কেননা এটাই জগতের ধর্মতা, যারা বুদ্ধগণের মাতা হন তারা এভাবেই পরলোকগমন করেন।

ফুস্য বোধিসত্ত্ব এই পাঁচটি বিষয় যখন দেখলেন সবকিছু ঠিক আছে তখন তিনি দশ হাজার চক্রবালের দেবগণের প্রার্থনা অনুমোদন করলেন। তারপর বোধিসত্ত্ব দেবগণকে বিদায় দিয়ে তুষিত স্বর্গের দেবগণের মাধ্যমে পরিবেষ্টিত হয়ে একটি সুরম্য নন্দনবনে প্রবেশ করলেন। এই নন্দনবন থেকেই সকল বোধিসত্ত্বরা শেষ জন্মে দেবগণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে থাকেন।

(সুত্রপিটক- দীর্ঘনিকায়ের মহাবর্গের "মহাপদান সূত্র" অনুসারেই লিখিত হয়েছে। এই মুল সূত্রে, অট্ঠকথা ও টীকায় বোধিসত্ত্বগণের জন্ম নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পাঠকগণের বুঝার সুবিধার্থে বোধিসত্ত্বগণের জন্ম ব্যাখার মূলভাবটি এখানে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

বাদবাকী বিষয়টি প্রতিসন্ধি থেকে ভূমিষ্ট পর্যন্ত আমাদের গৌতম বুদ্ধের সাথে যা যা সংঘটিত ঘটনা ঘটেছে সবকিছু ঘটনা ফুস্য বুদ্ধাংকুরের সাথেও একই ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছে। বাকী বিষয় জানতে হলে গৌতমবুদ্ধের জীবনী পড়ুন। সেই বিষয় নিয়ে কারও কোন অজানা থাকার কথা নয়। আমার মনে হয়, সবারই জানা আছে তাই আমি এখানে বাকীটা যোগ করলাম না। সেই ঘটনাগুলো এক নিয়ম হওয়ার কারণ হচ্ছে- এগুলোই জগতের ধর্মতা বলে বুদ্ধ ভিক্ষুগণের কাছে ব্যক্ত করেছেন।

ধরাধামে এক শান্তসূর্যের আগমন ও তার করুণ বিদায়

সৌভাগ্যবতী পূণ্যভূমি নন্দনকানন কাসিকনগরের প্রজাপালক ছিলেন করুণাধার ক্ষত্রিয় রাজা জয়সেন এবং মমতাময়ী রাণী ক্ষত্রিয়কন্যা সিরিমা। তারা দুজনই পারমীবান ও রূপসম্পন্ন দম্পতি, পুণ্যে পুণ্যবতী, গুণে গুণবতী, রূপে রূপবতী, সর্বদিশায় স্বরসতী। পারমীসম্পন্ন রাজা রাণী সম্যক সম্বুদ্ধের মাতা-পিতা হওয়ার জন্য উৎসাহ নিয়ে লক্ষ কল্পকালব্যাপী পারমী পূরণ করে এসেছেন। তাদের পারমীগুলো পরিপূর্ণ হয়েছে। তারা এখন শুধু অপেক্ষা করছেন সম্যক সম্বুদ্ধ কখন জন্ম নেবেন তাদের ঘরে। জন্ম নিয়ে তাদেরকে ধন্য কখন করবেন। তারা দুজনই দীর্ঘ পদযাত্রার সংসার করে এসেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের কোলে এখনো একটিও সন্তান নেই।

তাদের মন দুঃখ ভারাক্রান্তে ডুবে থাকে সারাক্ষণ। রাজা চিন্তা করেন আমার সদগতি হলে এই প্রাচুর্য ধনসম্পদ রক্ষা করবে কে? অবশেষে তাদের এই দুঃখ দূর করে দিতে জন্ম নিচ্ছেন তাদের ঘরে একজন মহাপুরুষ। তবে সম্পত্তি রক্ষার জন্য নয়। নিজে মুক্ত হয়ে, সত্ত্বগণকে দুঃখ থেকে মুক্ত করার জন্যেই জন্ম নিচ্ছেন অন্যকোন উদ্দেশ্যে নয়। তাদের ঘরে যিনি জন্ম নিচ্ছেন তিনি হলেন ফুস্য বোধিসত্ত্ব। যতক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধ হবেন না ততদিন তিনি বোধিসত্ত্ব নামে গণ্য হবে। দীর্ঘ কল্প-কল্পান্তর অপেক্ষার পর অবশেষে রাজা জয়সেন ও রাণী সিরিমার জন্য শুভ সংবাদ এসে উপস্থিত হল। তখনকার সময়ে লোকজনদের একটি ধারাবাহিক রীতি ছিল যে, পূর্ণিমা হওয়ার এক সপ্তাহ পূর্ব থেকে পূর্ণিমা পরদিন পর্যন্ত তারা মেলার আয়োজন করতেন। যেমন বর্তমানে-বাণিজ্য মেলা, বিজয় মেলা, বইমেলা, মহামুনি মেলা ইত্যাদি এই ধরনের মেলাকে বুঝে নিতে পারেন বা ধারণা করতে পারেন। তদ্রুপ প্রাচীন সময়েও এই সাপ্তাহিক কাল পর্যন্ত পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে একটি উৎসবের প্রচলন ছিল। উৎসবটির নাম হচ্ছে নক্ষত্র উৎসব। আরেকদিকে এই উৎসবটিকে নক্ষত্র মেলাও বলা যায়। এই নক্ষত্র উৎসবে একে একে সবাই যখন যোগদান করতে লাগলেন তখন সিরিমা চিন্তা করলেন, আমি মেলায় যাব না। মেলায় অংশগ্রহণ না করে আমি বরঞ্চ এই এক সপ্তাহ পর্যন্ত উপোসথব্রত পালন করব। সত্যবাদীগণের একচিন্তা, এককাজ, এককথা। সিরিমাও তাই করলেন। নক্ষত্র উৎসব উদ্বোধনী দিনে সিরিমা ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে স্নান করলেন। স্নান করে পরিষ্কার পোশাকও পড়ে নিলেন। অতপর অষ্টশীল অধিষ্ঠান করলেন।

সিরিমা এভাবে সপ্তাহকালব্যাপি উপোসথব্রত পালন করতে লাগলেন। যেকোন মেলা সাধারণত শেষের দিকে একটু বেশি জাঁকজমক হয়। সেদিন ছিল শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা। পূর্বের আকাশে চন্দ্রমামা সুস্বাস্থ্য ও বলিষ্ঠভাবে দেখা দিল হাসিমুখে। সবাই যখন নক্ষত্রমেলায় ব্যস্ত তখন সিরিমা উপোসথব্রত পালনের-ত। যারা পুন্যবান পুরুষ তারা এইজন্যই তো বেছে নেন শীলবানও পুণ্যবতী

নারীকে। পুণ্যবানও পুণ্যবতীরা যাতে গর্ব করে বলতে পারেন এটা আমার মা, এটা আমার জননী। এটা ও জগতের একটি ধর্মতা। প্রতিদিনের ন্যায় পূর্ণিমারদিনও সিরিমা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেড়ে নিলেন। তারপর পরিষ্কার পোশাক পড়ে অষ্টশীলগুলো অধিষ্ঠান করে একটি পালঙ্কে বসে শীলানুস্মৃতি ভাবনা করতে লাগলেন। সিরিমা এভাবে সারাদিন ভাবনা করার পর যখন রাত হল তখন ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাত্রী যখন গভীর হল তখন তিনি এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন চারজন অপূর্ব সৌন্দর্য দেবতা এসে পালঙ্কসহ তাকে তুলে নিয়ে গেলেন হিমালয়ের মানস সরোবরের কাছে (অনবতপ্ত হ্রদে)। তারপর তারা রাণীকে একটি গাছের নিচে সমতল জায়গায় রেখে একপাশে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এরপর তাদের দেবী বা স্ত্রীরা এসে রাণীকে মানসসরোবরে স্নান করালেন। তারপর উত্তম পোশাক পড়িয়ে নানা সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে সাজালেন। তারপর দেবতারা সরোবর থেকে একটু দূরে একটি সোনার প্রাসাদের ভিতর নিয়ে গিয়ে নানাদিক রজনী দ্বারা সাজানো একটি সোনার পালঙ্কে শুয়ে দিলেন। তারপর রাণী দেখলেন, একটি সাদা হাতি শূঁড় দিয়ে একটি পদ্মফুল ধরে বিশাল শব্দ করে ডাকতে ডাকতে রাণীর পালঙ্কের চারপাশে প্রদক্ষিণ করতে-করতে রাণীর গর্ভে প্রবেশ করে, ফুস্য বোধিসত্ত্ব প্রতিসন্ধি গ্রহণ করলেন। ফুস্য বোধিসত্ত্ব যখন মায়ের গর্ভে প্রতিসন্ধি নিয়েছিলেন তখন জগতে বত্রিশ প্রকার অদ্ভুত ঘটনা দেখা দিয়েছিল।

সেই বত্রিশটি ঘটনা হল যথাক্রমে:

১। দশ হাজার চক্রবালে ভূমিকম্প হওয়া।
২। দশহাজার চক্রবালে আলোর জ্যোতি বের হওয়া।
৩। যারা বধির অর্থাৎ যারা কানে শুনতে পেতেন না তারা সবকিছু শুনতে লাগলেন।
৪। যারা অন্ধ তারা সবকিছু দেখতে লাগলেন।
৫। যারা বোবা তারা কথা বলতে লাগলেন।
৬। যারা হত-দরিদ্র তাদের মাঝে প্রয়োজনীয় সম্পত্তি উৎপন্ন হল।
৭। যারা পঙ্গু তারা হাঁটাচলা করতে লাগলেন।
৮। যারা রাজা, শ্রেষ্ঠী ও অন্যান্য কারণে বন্ধী ছিল সে সমস্ত প্রাণীগণ বন্ধনমুক্ত হল।
৯। নরকের আগুন নিভে গেল।

পাদ-টীকা:

রাজা জয়সেন ও রাণী সিরিমার মৈত্রী, প্রেম-ভালোবাসা করুণা-মুদিতা এসব প্রশাংসা করতে গিয়েই 'স্বরসতী' শব্দটির উল্লেখ করেছি। তাদের চারদিক আচার ব্যবহার খুবই সুন্দর ছিল এই অর্থে দেবগণের ন্যায় ছিল তাদের সংসারযাত্রা। তার জন্য স্বরসতী, অন্যকোন দেবীর নাম নয়।

১০। প্রেতলোকের সত্ত্বগণের দুঃখ-দুর্দশা বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিল। ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারিত হল।

১১। জগতের সমস্ত প্রাণীগণ ভয়মুক্ত হয়ে একে অপরের সাথে মিশে গেল।

১২। জগতের সমস্ত রোগগ্রস্থ প্রাণীগণ রোগমুক্ত হল।

১৩। জগতের মধ্যে যারা মিথ্যা, কটু, ভেদ, কর্কশ ও সমপ্রলাপ বাক্য বলতেন তারা সকলেই সুভাষিত বাক্য বলতে লাগলেন।

১৪। বিশ্বের সমস্ত গোড়াগুলো খুশিতে আত্মহারা হয়ে মধুর ধ্বনিতে ডাকতে লাগল।

১৫। বিশ্বের সমস্ত হাতিগুলো খুশিতে আত্মহারা হয়ে মধুর ধ্বনিতে ডাকতে লাগল।

১৬। দশ হাজার চক্রবালের সমস্ত বাদ্যযন্ত্রগুলো আপনা-আপনি কোনো বাদক ছাড়াই মধুর সুরে বেজে উঠল।

১৭। দেব-মনুষ্যগণের পরিহিত স্বর্ণ-রৌপ্য-অলংকারগুলো কোনো আঘাত ছাড়াই বেজে উঠল।

১৮। পৃথিবীর ময়লা-আবর্জনাগুলো বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে সমস্ত পৃথিবী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সুগন্ধিতে ভরে উঠল।

১৯। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীগণের আরামদায়ক সুশীতল বাতাস সমানভাবে প্রবাহিত হল।

২০। বর্ষাকাল না হয়েও আকাশে মেঘ উঠে বৃষ্টি বর্ষিত হল।

২১। পৃথিবী ভেদ করে সুপেয় পানি উত্থিত হল।

২২। পাখিরা আকাশে উড়া বন্ধ করে শান্ত স্বভাবের হয়ে যার যার অবস্থান যোগ্য স্থানে বসে পড়ল।

২৩। নদ-নদীর পানি শান্ত-স্থির হয়েছিল।

২৪। সাগরের নোনাপানি বা লবণাক্ত পানি মিঠা পানিতে পরিণত হয়েছিল।

২৫। সমস্ত দিকে, সমস্ত ভূমিতে লাল, নীল, হলুদ, সাদা ও কমলা এই পাঁচ রং এর পদ্মফুল ফুটেছিল।

২৬। জলের মধ্যেও পাঁচ রং এর পদ্ম প্রষ্ফুটিত হল।

২৭। সমস্ত গাছগুলোর মধ্যে ফুল ফোটে ভরে গিয়েছিল।

২৮। যে পদ্ম এখনো কলি গোড়ায় বিদ্যমান সেই পদ্মটিও প্রষ্ফুটিত হয়েছে, যে পদ্ম এখনও পানির গভীরে অর্থাৎ এখনো পাতার শাখা মাঝখান বরাবর বিদ্যমান সেটিও প্রষ্ফুটিত হল, যে পদ্ম পানির উপরে উঠে এসছে বা পাতার সমান হয়েছে সেই পদ্মটিও প্রষ্ফুটিত হল, এই তিন ধরনের পদ্মফুল একসাথে প্রষ্ফুটিত হয়েছে।

২৯। শিলাখণ্ড ভেদ করে শুধুমাত্র ডাঁটা দ্বারা (দণ্ড) পদ্মফুল প্রষ্ফুটিত হল।

৩০। অনন্ত আকাশে পদ্মফুলের মালা ঝুলতে লাগল। চারদিকে, পদ্ম, পারিজাত, উদুম্বর, দিব্যমণ্ডারসহ আরও অসংখ্য ফুলের বৃষ্টি হতে লাগল।

৩১। আকাশে দিব্য সংগীতের মধুর ধ্বনিতে ধ্বনিত হল।

৩২। দশ হাজার চক্রবাল একদম পরিষ্কারভাবে দেখা দিয়েছিল।

আবার সমস্ত জগৎজুড়ে যেখানে যেখানে অনন্তকাল ধরে অন্ধকার থাকে সেখানে ও দিব্য আলো প্রবেশ করে অন্ধকার দূরীভূত করল। তখন মনুষ্যলোক, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক ও সমস্থলোকের সত্ত্বগণ পরিষ্কারভাবে একে-অপরকে দেখতে পেয়েছিল। বাকীটা গৌতম সিদ্ধার্থের সাথে যা যা হয়েছিল প্রতিসন্ধি পর থেকে ভূমিষ্টের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এখানেও সেইরকম দ্রষ্টব্য বা বুঝতে হবে।

ফুস্য বোধিসত্ত্ব দীর্ঘ দশ মাস গর্ভে অবস্থান করার পর, যখন ভূমিষ্ট হওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে, তখন রাণী সিরিমার অন্তরে বাবার বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা উৎপন্ন হল। তিনি রাজাকে তার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন। রাজা জয়সেন অনুমতি দিলেন এবং কাসিকনগর থেকে শুরু করে রাণীর পিত্রালয় পর্যন্ত (রাণী সিরিমার পিত্রালয়ের নামটি পাওয়া যায়নি)। সমস্ত রাস্তা পতাকা ও ধর্মঘট দ্বারা সাজিয়ে দিলেন। অসমতল জায়গা সমতল করে দিলেন। তারপর দিন রাণী সিরিমা রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রক্ষী ও পরিচারিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বাবার বাড়ির দিকে যাত্রা আরম্ভ করলেন। রথ চলছে আপন পথে। দৃষ্টিনন্দনীয় রথের চারপাশে রক্ষী ও পরিচারিকারাও হেঁটে চলছে খুশি মনে। রাণী সিরিমাও প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে যেতে থাকলেন। কাসিকনগর ও রাণীর পিত্রালয় এই দুই নগরের মাঝখানে একটি বিশাল বন বিরাজমান। সেই বন বা উদ্যানটির নাম হচ্ছে- সিরিম উদ্যান। এই সিরিম নামক উদ্যানটি তখন এতই সৌন্দর্যশালী দেখাচ্ছিল যে, দেখতে মনে হচ্ছিল বিশ্বকর্মা দ্বারা সাজানো স্বর্গীয় কোনো দিব্য উদ্যান। গাছে-গাছে, লতায়-লতায়, ঘাসে-ঘাসে, লাল-নীল, হলুদ, সবুজ, সাদা, গোলাপী, বাদামী ও আরও বিবিধ রংসহ অসংখ্য ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে যার যার অবস্থান থেকে সৌন্দর্যের জ্যোতি বিচ্ছুরিত করছে। ফুলগুলোকে দেখতে মনে হচ্ছিল হেসে হেসে তারা যেন কোনো এক মহাপুরুষের আগমনকে স্বাগত জানাচ্ছে। অবশেষে রাণী সিরিমার রথটি ধীর গতিতে চলতে চলতে ‘সিরিম’ নামক উদ্যানে এসে উপস্থিত হল। চারদিকে ফুলেভরা অপরিসীম সৌন্দর্যময়ী এই উদ্যানটি দেখে রাণী সিরিমার মনের মধ্যে ইচ্ছা উৎপন্ন হল মনোরম উদ্যানটির সৌন্দর্য উপভোগ করার, একটি বার ঘুরে দেখার তার স্বাদ হল। সিরিমা মন্ত্রীকে আদেশ করল রথ থামাতে। রথ থামল। তারপর সিরিমা রথ থেকে নেমে চারদিক ঘুরে দেখতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি উপস্থিত হলেন ফুলভর্তি একটি গাছের নিচে। গাছটির গোড়া থেকে প্রতিটি শাখার মাথা পর্যন্ত ফুল ফোটে সম্পূর্ণ অপরূপ জ্যোতি বের হচ্ছে। ফুলেভরা গাছটি যেন, নিজের ইচ্ছাতেই রাণীকে কাছে টেনে নিয়েছে। রাণী ফুলভর্তি সৌন্দর্যভরা গাছটি দেখে গাছটির নিচে গিয়ে দাঁড়ালেন। গাছটির নিচে দাঁড়াতেই তার ইচ্ছা হল ফুলভর্তি একটি ডাল ধরার। রাণী সিরিমার এই ইচ্ছাটি উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে গাছের একটি ডাল নিচে নেমে আসল। এই দৃশ্য

দেখে রক্ষী ও পরিচারিকারা আশ্চর্য হলেন! এটা কেমনে সম্ভব? হ্যাঁ সবই সম্ভব। সিরিমার গর্ভে যে সন্তানটি আছে, সেই সন্তানটি যেমন তেমন সত্ত্ব নন। তিনি যে দশ হাজার চক্রবালের সত্ত্বগণের দ্বারা পূজিত হবেন। দেব-মনুষ্য-ব্রহ্মলোকের ব্রহ্মারা তাকে পূজা করবেন। তারপর রাণী সিরিমা গাছের ডালটি ধরা মাত্রই তার গর্ভবেদনা উৎপন্ন হল। তারপর পরিচারিকারা তাড়াতাড়ি রাণীর চারপাশে পর্দা দিয়ে ঘিরে দিলেন। এরপর রক্ত, শ্লেষ্মা, গর্ভমল বা তরল পদার্থ এবং গর্ভথলী ছাড়াই ফুস্য বোধিসত্ত্ব ভূমিষ্ট হলেন। বোধিসত্ত্ব ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতি-সন্ধি গ্রহণের সময় যে যে বত্রিশটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল, সেই ঘটনাগুলোও ভূমিষ্টের সময় পরিলক্ষিত হল। অনন্ত আকাশ থেকে দিব্যমণ্ডার ফুল দ্বারা দেবতারা ফুল ছিটিয়ে দিয়ে পূজা করছেন। দেবতারা মধুর সুরে বীণা বাজাচ্ছেন ইত্যাদি। ফুস্য বোধিসত্ত্ব যে জন্ম নিয়েছেন কিন্তু ভূমি স্পর্শ করলেন না। কেননা ভূমি স্পর্শ হওয়ার আগে শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকের ব্রহ্মারা স্বর্ণজাল দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের হাত থেকে চারজন মহারাজা হরিণের চামড়া দিয়ে তৈরি কাপড় দ্বারা গ্রহণ করলেন। (এখানে মহারাজা বলতে চারজন দেবপুত্রকেই বুঝানো হচ্ছে অথবা চারলোকপাল দেবরাজদেরকেই বুঝতে হবে)। অতপর চারজন দেবগণের মহারাজাদের হাত থেকে মানুষেরা অতিশয় সুক্ষ্ম ও নরম রেশমি কাপড় দ্বারা গ্রহণ করলেন। (এখানে মানুষেরা বলতে দেবতারা বোধিসত্ত্বকে সিরিমার হাতেই তুলে দিয়েছেন সেটা বুঝতে হবে)। দেবতারা ফুস্য বোধিসত্ত্বকে রাণীর হাতে দেয়ার পর রাণীকে বললেন- দেবি মাতা; মহান খুশি ও মহান আনন্দিত হবার সময় হয়েছে।

আপনার এই পুত্রটি মহাপুণ্যবান, তিনি মনুষ্যলোক, দেবলোক ও ব্রহ্মলোক জয় করবেন। তারপর আকাশ থেকে দুটি ঝর্ণা দ্বারা নেমে আসল পৃথিবীতে। একটি শীতল যা স্বাভাবিক ব্যবহৃত পানির তুল্য, আরেকটি কুসুম কুসুম গরম। এরপর দেবতা ও মনুষ্য মিলে দুটি ঝর্ণাধারার পানি দিয়ে রাণী সিরিমা ও ফুস্য বোধিসত্ত্বকে স্নান করালেন।

এরপর ফুস্য বোধিসত্ত্ব ভূমিস্পর্শ করে দুই পায়ে দাঁড়ালেন, তারপর তিনি নিজ থেকে একা একা উত্তরমুখী হয়ে সাতকদম পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেলেন এবং প্রতি কদমের সময় পা মাটিতে স্পর্শ করার সময় মাটি ভেদ করে সাতটি পদ্মফুল প্রস্ফুটিত হল। বোধিসত্ত্ব যখন উত্তরমুখী হয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন দেবতারা দিব্য সাদা ছাতি বেধিসত্ত্বের মাথার উপর ধরে বোধিসত্ত্বকে শ্রদ্ধা, সম্মান, গৌরব ও ভক্তি প্রদর্শন করলেন। ফুস্য বোধিসত্ত্ব সাত পা এগিয়ে যাওয়ার পর দাঁড়ালেন এবং দাঁড়িয়ে তিনি চারদিকে অবলোকন করে দেখলেন। তারপর ফুস্য বোধিসত্ত্ব ডান হাত তুলে একটি আঙ্গুল সোজা করে উপরের দিকে তুলে এই মহান বাক্যটি ভাষণ করলেন, যথা– এই জগতে আমিই অগ্র, আমিই জ্যেষ্ঠ, আমিই শ্রেষ্ঠ। এটাই আমার সর্বশেষ জন্ম। আমার আর কোনো জন্ম নেই।

বাদবাকী ঘটনাগুলো গৌতম সিদ্ধার্থের ঘটনাগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তারপর পর্যায়ক্রমে ফুস্য বোধিসত্ত্ব যখন যুবক বয়সে পদার্পণ করলেন তখন একদিন রাজা জয়সেনের মনে পড়ে গেল ব্রাহ্মণ ও গণকদের ভবিষ্যৎবাণীর কথা, তখন রাজা জয়সেন মনে মনে ভাবতে লাগলেন-আমার পুত্রকে গৃহে ধরে রাখতে হবে। তার মনের মধ্যে একটুও বিরাগময় চিন্তা আসতে দেওয়া যাবে না। রাজা এরূপ চিন্তা করে বোধিসত্ত্বকে সুখে রাখার জন্য তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দিলেন। প্রাসাদগুলো যথাক্রমে হল- (ক) গড়ুড় (খ) হংস ও (গ) সুবর্ণভরা। ঋতু অনুসারে ফুস্য বোধিসত্ত্ব এই তিনটি প্রাসাদে বসবাস করতে লাগলেন। এরপর রাজা জয়সেন কিসা গৌতমী (কৃশাগৌতমী) নামের একজন ক্ষত্রিয় কন্যার সাথে ফুস্য বোধিসত্ত্বকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দিলেন। কিসা গৌতমীসহ সর্ব অলংকারে ভূষিত তেইশ হাজার পরিচারিকা দ্বারা যেন স্বর্গের দেবপুত্র অপ্সরা পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করার ন্যায় ফুস্য বোধিসত্ত্বও সুখে জীবনযাপন করতে লাগলেন। দুঃখের লেশমাত্র ছিল না, ফুস্য বোধি সত্ত্বের। রাজা জয়সেন পুত্রকে বিন্দুমাত্র দুঃখ বিষয় দর্শন করতে দিলেন না, অগণিত সুখের মধ্যে-বিভোর করে রাখতে চাইলেন। রাজা জয়সেন সেটা চায়লে কি হবে, কিন্তু বিশ্ব-ধর্মতা অর্থাৎ জগতের নিয়ম তো সেটা চাই না। ফুস্য বোধিসত্ত্ব যে আজীবন গৃহে অবস্থান করার সত্ত্ব নন। একদিন ফুস্য বোধিসত্ত্বের অন্তরে ভীষণভাবে একঘেঁয়েমি দেখা দিল। তিনি নগর প্রদক্ষিণ করে, প্রকৃতির বিশুদ্ধ বাতাস শরীরে লাগাতে চান বলে পিতা জয়সেনকে জানালেন, বোধিসত্ত্বের এমন মিনতির কথা শুনে রাজা জয়সেনের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তিনি এতদিন যে ভয়টা পাচ্ছিলেন আজ সে ভয়টি নিশ্চিত হয়েছে। রাজা দুঃখভারাক্রান্ত মনে ছেলেকে, নগর প্রদক্ষিণের জন্য অনুমতি দিলেন। তারপর রাজা নগরবাসীদেরকে ডেকে গোপনে একটি আদেশ করলেন, রাজকুমার (ফুস্য বোধিসত্ত্ব) যতদিন রাজ্য পরিভ্রমণ করবে ততদিন যেন– জরাগ্রস্থ ব্যক্তি, ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি, মৃতব্যক্তি ও সন্ন্যাসী এই চারজন ব্যক্তিকে যেন ঘরের বাহিরে বা রাস্তাঘাটে ঘোরাফেরা করতে না দেয়া হয়। এরপর রাজা জয়সেন নগরের মূল রাস্তার মাথায় প্রতিটি গেইটে একজন করে প্রহরী বা রক্ষী নিযুক্ত করে দিলেন। তারপর দিন শুভ মুহূর্তে- সকালবেলায় বোধিসত্ত্ব নগর প্রদক্ষিণে বের হলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্রের আসন উত্তপ্ত হল এবং জোড়ে জোড়ে কম্পন দিতে লাগল। তিনি এর কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেলেন পৃথিবীতে মহাসত্ত্ব বা বোধিসত্ত্ব নগর প্রদক্ষিণে বের হয়েছেন।

তিনি আরও দেখলেন মহাসত্ত্বকে বৈরাগ্যময় নিমিত্ত দর্শন থেকে দূরে রাখা হয়েছে। তখন দেবরাজ ইন্দ্র মনে মনে চিন্তা করলেন আমাকেই কিছু একটা করতে হবে, নয়তো আমি আর এই আসনে বসতে পারব না। তারপর দেবরাজ ইন্দ্র একজন দেবপুত্রকে ডেকে আদেশ করলেন- যাও বাছা! কাসিকনগরে যাও! জগত রক্ষাকারী ভ্রমণরত মহাসত্ত্বের অন্তরে বিরাগময় চিত্ত উৎপন্ন করে দিয়ে আস।

এই দিকে ফুস্য বোধিসত্ত্ব অনেকক্ষণ ভ্রমণ করার পর খুশি মনে প্রাসাদের মধ্যে ফিরে যাবেন এমন সময়-দেবপুত্র দেবলোক থেকে চ্যুত হয়ে দেবরূপ পরিবর্তন করে, জরাগ্রস্থ ব্যক্তির রূপধারণ করে বোধিসত্ত্বের সামনে এসে রাস্তার ধারেধারে হাঁটতে লাগলেন।

তাকে দেখে ফুস্য বোধিসত্ত্ব সারথিকে জিজ্ঞেস করলেন সারথি ইনি কে? (বাকীটা গৌতম সিদ্ধার্থ সারথি ছন্দককে যেভাবে প্রশ্ন করেছিলেন এখানে ফুস্য বোধিসত্ত্বও সেভাবে প্রশ্ন করলেন) সারথির কাছ থেকে সবকিছু শোনার পর ফুস্য বোধিসত্ত্ব দুঃখিত মন নিয়ে প্রাসাদে ফিরে গেলেন। এভাবে দ্বিতীয় দিন ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি, তৃতীয় দিন মৃতব্যক্তি ও চতুর্থ দিন সন্ন্যাসী (ভান্তে বা শ্রমণ) রূপধারণ করে, সংসারের প্রতি ফুস্য বোধিসত্ত্বের অন্তরে বিতৃষ্ণা উৎপন্ন করে দিয়ে দেবপুত্র দেবলোকে ফিরে গেলেন।

চতুর্থদিন সন্ন্যাসীকে দেখার পর ফুস্য বোধিসত্ত্ব সংকল্প করলেন তিনিও সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবেন। এরূপ সংকল্প করে যখন প্রাসাদে ফিরছিলেন তখন তিনি শুনতে পেলেন তার একটা পুত্র সন্তান হয়েছে। তারপর ফুস্য বোধিসত্ত্ব আনমনে বলে উঠলেন "রাহু জাতো-বন্ধনো জাতো" অর্থাৎ রাহুর জন্ম হয়েছে, বন্ধনের জন্ম হয়েছে। ফুস্য বোধিসত্ত্ব ছয় হাজার বছর গৃহকর্মে অবস্থান করার পর যেদিনই চারিনিমিত্ত দর্শন করলেন সেদিনই হাতির গাড়ি করে, শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হলেন। এরপর ফুস্য বোধিসত্ত্ব গুরু খুঁজলেন। তিনি গুরু খুঁজতে খুঁজতে গুরু খুঁজে পেয়েছেন বটে কিন্তু তিনি দেখলেন সেই গুরুদের শিক্ষাটি মুক্তিমার্গ নির্বাণ পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে যাবে না।

তাই ফুস্য বোধিসত্ত্ব গুরুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজেই সাধনায় নিভৃত হলেন। তিনি এভাবে ছয়মাস ধ্যান করার পর একদিন শুভ বৈশাখী পূর্ণিমার তিথিক্ষণে আমলকি নামক বৃক্ষের নিচে বসে-মারকে পরাজয় করে জগতের সম্যক সম্বুদ্ধ হলেন। ফুস্য বুদ্ধ, বুদ্ধত্ব লাভ করার পর যখন বুঝতে পারলেন এই ধর্মজ্ঞান উপলব্দি করা সহজ ব্যাপার নয়। এই ধর্মজ্ঞান বুঝতে হলে অনেক ধৈর্য আর তিথিক্ষা করতে হয়।

পাদটীকা: রাহু জাতো, বন্ধন জাতো, এর অর্থ কী?
এখানে বোধিসত্ত্বগণ 'রাহু' বলে কাকে নির্দেশ করে থাকেন। রাহু মানে হিন্দু ধর্মের রাহু নয়। এখানে বোধিসত্ত্বগণ 'রাহু' মানে সংসারের মায়া মোহকেই 'রাহু' বলে নির্দেশ করে থাকেন। যেকোন সত্ত্ব তাদের-সন্তানদের ভীষণ ভালোবাসেন, আদর করেন, স্নেহ করেন। তাদের ছাড়া একমুহূর্তও অন্যকোথায়ও অবস্থান করতে পারেন না। সবসময় 'তাদের দিকেই মনের টান থাকে, তাই ফুস্য বোধিসত্ত্ব বলেছেন সন্তান জন্ম হওয়া মানে বন্ধনের জন্ম হওয়া, মায়া-মোহের জন্ম হওয়া।

জগতের সত্ত্বগণ পঞ্চকামগুণের সুখ আহরণে প্রমত্ত। তারা এই গভীর ধর্ম বুঝতে পারবে না। এরূপ চিন্তা করে ফুস্য বুদ্ধ ধর্ম প্রচারে বিমুখ হলেন। আর তখনই সহম্পতি মহাব্রহ্মা বুদ্ধের সামনে এসে হাত জোড় করে প্রার্থনা করে বললেন– প্রভু! ভান্তে ভগবান, এরূপ করবেন না। জগত অতলে যাবে। আপনি ধর্ম প্রচার করুন। সত্ত্বগণ আপনার ধর্ম বুঝতে পারবেন। এভাবে সহম্পতি মহাব্রহ্মার প্রার্থনা করার পর বুদ্ধ চিন্তা করে দেখলেন কে আমার ধর্ম বুঝতে পারবেন? কাকে আগে ধর্মদেশনা করা যায়? এমন চিন্তা করায় তিনি বুঝতে পারলেন ছয়মাস যাবত যারা আমার অনুসারে বা অনুসারী ছিলেন তাদেরকে আগে ধর্মদান দেওয়া উচিত। আবার দেখলেন তারা এখন কোথায় অবস্থান করছে? তিনি দেখতে পেলেন তারা এখন সারানাথ মৃগদাবে হরিণদের বিচরণের বা চলাফেরার স্থানে অবস্থান করছেন। তারপর ফুস্য বুদ্ধ সারনাথ মৃগদাবে গিয়ে নক্ষত্র মঙ্গল নামে একটি উৎসবের দিনেই ধর্মচক্র প্রবর্তনসূত্র দেশনা করলেন। এই ধর্মচত্র প্রবর্তন সূত্র শ্রবণ করে কোটি, শত, হাজার কোটি, প্রাণী ধর্মজ্ঞান উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন। পরে রাজা জয়সেন তার নাতিসহ অর্থাৎ ফুস্য বোধিসত্ত্বের পুত্র অনুপমসহ স্বপরিবার প্রব্রজ্যা ধর্মে দিক্ষীত হয়ে অর্হৎ হয়েছিলেন। জগতে যেসকল বুদ্ধগণ আবির্ভূত হয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও যারা হবেন তাদের প্রত্যেকজনেরই, সকল বুদ্ধগণের একজন বিশিষ্ট শিষ্য-সেবক ভিক্ষু, দুইজন বিশিষ্ট অগ্রশ্রাবক, দুইজন অগ্রশ্রাবিকা, দুইজন বিশিষ্ট উপাসক, দুইজন বিশিষ্ট উপাসিকা থাকে। তদ্রূপ ফুস্য ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধেরও ছিল। যেমনঃ ভগবান ফুস্য সম্যক সম্বুদ্ধের দুজন অগ্রশ্রাবক ছিলেন-ভিক্ষু সুখিত ও ধর্মসেন। বিশিষ্ট সেবক ছিল সভিয় ভিক্ষু। অগ্রশ্রাবিকারা ছিলেন- সালা ও উপসালা নামে দুজন ভিক্ষুণী। বিশিষ্ট অগ্র উপাসকগণ ছিলেন 'ধনঞ্জয় ও বিশাখ' নামক দুজন শ্রেষ্ঠী। বিশিষ্ট অগ্র উপাসিকাগণ ছিলেন পদুমা ও নাগা নামে দুজন শ্রেষ্ঠীকন্যা। ফুস্য বুদ্ধ উচ্চতায় ছিলেন আটান্ন (৫৮) হাত এবং তার পরাময়ু ছিল নব্বই হাজার বছর। ফুস্য বুদ্ধও নব্বই হাজার বছর জীবিত থেকে সত্ত্বগণের মাঝে ধর্মপ্রচার করার পর কুশিনগরে গিয়ে সেনা বা সোন নামক একটি বিহারে অর্থাৎ সেনা বা সোন নামক একটি বনে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন। (সংক্ষিপ্ত)

বি.দ্র. পালি বা অর্থকথায় 'সেনারামে' উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্তর্জগতে বেড়ে ওঠা বিশাল এক অগ্নির খনি

মানুষ বা প্রাণীগণের অন্তরে জেগে ওঠা হিংসার আগুনই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। মানুষের অন্তরে এই হিংসার আগুন একবার জ্বলে উঠলে আর সহজে নেভানো সম্ভব নয়। এই হিংসার আগুন যার অন্তরে জেগে ওঠে শুধু সেই ব্যক্তিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে না, সেই আগুন অপরকেও তার জ্ঞাতী, বন্ধু-বান্ধব, শত্রুসহ সবাইকে তিলে তিলে মারে। ভগবান ফুস্য বুদ্ধ যখন জীবিত ছিলেন তখন একদল মানুষের অন্তরে হিংসার আগুন লেগেছিল। তারা সেই আগুনটি যেই কিনা জ্বালালেন তখন থেকে তারা নিজেদের আগুনেই দাউ দাউ করে জ্বলছেন কল্প-কল্পান্তর। তারা সেই আগুন বহুবার নেভানোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কেউ নিভিয়ে দিতে পারেনি। তাদের সেই আগুনের খনি নিভেছিল গৌতম-বুদ্ধের সময়কালে এসে। এই জন্যে বুদ্ধ বলেছেন– রাগের সমান অগ্নি বা আগুন নাই, দ্বেষের সমান কলি বা পাপ নাই। পঞ্চস্কন্ধ সদৃশ দুঃখ নাই, শান্তি অপেক্ষা সুখ নাই। (সুখবর্গ-গাথা-৬, ধম্মপদ)

আজ থেকে প্রায় বিরানব্বই কল্পের আগে জম্বুদ্বীপে কাসিক (কাশী) নামে একটি নগর ছিল। নগরটি খুবই সমৃদ্ধশালী ছিল। সেই নগরের প্রজাপালক তথা রাজা ছিলেন জয়সেন, রাণী সিরিমা (শ্রীমা), রাজা জয়সেন এর ঔরসে ও রাণী সিরিমার গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন ফুস্য বোধিসত্ত্ব। তিনি ভূমিষ্ট হয়ে ক্রমান্বয়ে চারিনিমিত্ত দর্শন করার পর সন্ন্যাসী হয়ে বুদ্ধ হলেন। এরপর ফুস্য বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করার পর দিকে দিকে ধর্মপ্রচার করতে লাগলেন। এভাবে কেটে যায় দুইশত বছর। তারপর একদিন রাজা জয়সেনের কাছে খবর যায় তারপুত্র সম্যক সম্বুদ্ধ হয়েছেন। রাজা জয়সেন এই খবরটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন। আহা কত বছর হয়েছে আমার পুত্রকে দেখিনি। এভাবে চিন্তা করতে করতে তিনি পুত্রের সংজ্ঞায় বুদ্ধের প্রতি করুণাচিত্ত উৎপন্ন করলেন। তারপর রাজা জয়সেন বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করার জন্য একজন দূত পাঠালেন। দূত যথাসময়ে বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে পিতার নিমন্ত্রণ বাক্য বুদ্ধকে জ্ঞাত করলেন। পিতার নিমন্ত্রণ পেয়ে তথাগত ফুস্য সম্যক সম্বুদ্ধ মহাভিক্ষু সংঘসহ কাশীনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এভাবে দীর্ঘ পথযাত্রার পর অবশেষে ফুস্য বুদ্ধ পৌঁছে গেলেন পিতার গৃহে। বহুবছর পরে বুদ্ধকে দেখতে পেয়ে পিতা জয়সেন চোখের জল মুছতে মুছতে জ্ঞাতীসমৃদ্ধ হয়ে বুদ্ধসহ মহাভিক্ষু সংঘকে বন্দনা করলেন। তারপর তিনি বুদ্ধসহ ভিক্ষুসংঘের জন্য বসবাসের স্থান ব্যবস্থা করে দিলেন। এরপর তিনি বুদ্ধসহ মহাভিক্ষু সংঘের সেবা পূজা করতে লাগলেন নিজের হাতে। রাজা জয়সেন বুদ্ধসহ মহাভিক্ষু সংঘের সেবার কাজে কাউকে নিয়োগ দিতেন না। তিনি এসব পছন্দ করতেন না। শুধুমাত্র নিজেই সেবা পূজা করতেন। কারণ রাজা চিন্তা করতেন আমার পুত্র গৃহত্যাগ করে বুদ্ধ হয়েছেন। পুত্র যখন আমার বুদ্ধও আমার, ধর্মও আমার, সংঘও আমার।

এভাবেই তিনি মনের মধ্যে করুণাকে স্থান দিয়ে করুণাবশত সকল সেবার কার্যক্রম নিজেই চালিয়ে দিতেন। অন্যকেউ সুযোগ পেত না। রাজা জয়সেন যতদিন পর্যন্ত প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষিত হয়নি বা অর্হত্ত্ব ফল লাভ করেননি ততদিন পর্যন্ত যখনই বুদ্ধ নিজগৃহে যেতেন ততদিন রাজা জয়সেন নিজ হাতে বুদ্ধসহ মহাভিক্ষু সংঘকে সেবা করতেন এবং সেবা করে গেছেন। এভাবে যখন কেউ বুদ্ধকে সেবা করতে পারছিলেন না তখন বুদ্ধের তিনজন বৈমাত্রেয় ভাই চিন্তা করতে লাগলেন। জগতের, সম্যক সম্বুদ্ধগণের জন্ম হচ্ছে সকল প্রাণীর মুক্তির জন্য, মঙ্গলের জন্য, একজনের জন্য তো নয়। এভাবে থাকলে আমরা বুদ্ধের সেবা করতে পারব না। বুদ্ধকে সেবার করার উপায় খুঁজো খুঁজো। তারা তিনভাই মিলে একে অপরকে এভাবে বলতে লাগলেন। তিনজনে মিলে চিন্তা করতে করতে অবশেষে একটি উপায় বের করল। সেটি হচ্ছে অন্য একটি গ্রামের-গ্রামবাসীদেরকে অর্থ দিয়ে বা স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দুষ্টমি ধরনের একটি সমস্যা সৃষ্টি করতে বলল। এবং সব কিছু তারা বুঝিয়ে দিল যে, এই সমস্যা বা ঝামেলায় কোনো প্রকার ক্ষতি যেন না হয়। বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা এভাবে পরিকল্পনা করার পর পিতা জয়সেনকে খবরটি জানাল। তারা বলল পিতা অমুক জায়গায় বা গ্রামে একটি ঝামেলা হয়েছে। তাদের মুখ থেকে এই ঝামেলার কথা শুনে রাজা একটু চমকে গেলেন। কেননা তার অধীনে থাকা প্রতিটি গ্রাম এবং গ্রামবাসীরা সুখেই বসবাস করছে। কোন ঝামেলা হওয়ার তো কথা নয়। প্রথমে রাজা বিশ্বাস করলে না। পরে তিনভাই মিলে পিতাকে বিশ্বাস করালেন। তারপর রাজা জয়সেন ঝামেলাটি দমনের জন্য বা সমাধানের জন্য তিনভাইকে পাঠালেন। তখন তিন ভাই ঐ গ্রামে গিয়ে সমস্যাটি সমাধান করে নগরে ফিরে আসলেন। তাদের সুস্থভাবে গৃহে ফিরে আসতে পারাটা দেখে রাজা খুব খুশি হলেন। খুশি হয়ে তাদের তিনভাইকে বর দিতে চায়লেন বা আশীর্বাদস্বরূপ তাদের প্রিয় কোনো কিছু উপহার দিতে চায়লেন। রাজা বললেন– বাবারা তোমরা কি পেতে চাও বলো?

পিতার এই বরদানের কথা শুনে বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা বললেন- পিতা আমরা ভগবান বুদ্ধকে সেবা করতে চায়। এটা ছাড়া আমরা আর কিছু চায় না। রাজা বললেন- এটা দিতে পারবো না তোমরা অন্য কিছু চাও।

তারাও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিল বুদ্ধকে সেবা করা ছাড়া তাদের অন্য কিছু চাওয়া-পাওয়া নেই। পুত্রদের এই কথা শুনে রাজা এবার না করতে পারলেন না। তবে নির্ধারিত সময়ের জন্য যখন ইচ্ছা হবে তখন সেবা করবে এমন কিন্তু নয়। তিন ভাইকে রাজা জিজ্ঞেসা করলেন- বলো তোমরা কতোদিন বুদ্ধের সেবা করতে চাও? তারা বললেন সাতবছর। রাজা অনুমতি দিলেন না বা রাজি হলেন না। পরে তারা ছয়বছর, পাঁচবছর, চারবছর, তিনবছর, দুইবছর, একবছর, সাতমাস, ছয়মাস, পাঁচমাস, চারমাস এভাবে সময় চাইতে চাইতে

তিন মাসে যখন আসল তখন রাজা রাজি হয়ে অনুমতি দিলেন। তবে রাজা এটাও বলে দিলেন যে, তিন মাসের থেকে যেন সময় বেশি না হয়। বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভাইরা বললেন ঠিক আছে বাবা, তাই হবে। রাজা বা বাবার কাছ থেকে বুদ্ধসহ মহাভিক্ষুসংঘকে সেবা করার অনুমতি পেয়ে তিন ভাই মহাখুশি। তারপর তারা ভগবান বুদ্ধের কাছে গিয়ে বুদ্ধকে বন্দনা করে বললেন- ভান্তে ভগবান-ভগবানসহ মহাভিক্ষুসংঘকে আগামী তিনমাস সেবা-পূজা করতে চাই। ভান্তে ভগবান, বর্ষাবাসের এই তিন মাসের জন্য আমাদের ফাং গ্রহণ করুন। ভগবান বুদ্ধ নীরবে বা মৌনতার সাথে তাদের ফাং গ্রহণ করলেন। বুদ্ধ ফাং গ্রহণ করেছেন তারা এই বিষয়টি বুঝতে পেরে খুবই খুশি হলেন এবং তারা নিজ সম্পত্তি, মৃত্যুকালীন পরম বন্ধু এই মহান দানের পুণ্যফল তারা হাতছাড়া না করে যথাযোগ্য সুব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অতঃপর ফুস্য বুদ্ধের বৈমাত্রেয় (সৎ ভাই অর্থাৎ পিতা এক, মাতা অন্যজন) ভাইয়েরা নিজেদের রাজ্যের কর্মচারীকে একটি চিঠি পাঠালেন। তারা যে চিঠিটি লিখলেন সেই চিঠিতে উল্লেখ ছিলঃ গম্ভীর আদেশ কিন্তু গম্ভীর আদেশ হলেও ভাষা ছিল স্নেহময় ও মমত্ববোধে পরিপূর্ণ। সেখানে লেখা ছিল- শোনো বন্ধু, আগামী তিন মাসের জন্য আমরা পরম পূজ্য ভগবান বুদ্ধকে ফাং করেছি এবং আমরা এই তিনমাস বুদ্ধকে সেবা করব। যত দ্রুত সম্ভব বুদ্ধসহ ভিক্ষুসংঘের থাকার উপযোগী করে একটি বিহার তৈরি কর।

শুধু বিহার নয়, বুদ্ধসহ ভিক্ষুসংঘের সেবার কাজে যা কিছু দরকার হয় তুমি যাবতীয় সবকিছু ব্যবস্থা করে রাখ। বিহার তৈরি থেকে শুরু করে সেবার কাজের ছোটখাটো সব আয়োজনই যেন নিখুঁতও রাজকীয় মর্যাদা সম্পন্ন হয়। রাজপুত্রদের আদেশও নির্দেশসম্পন্ন এই চিঠি পেয়ে, রাজ কর্মচারী আর দেরি করেলেন না। তিনি সেদিনই কাজে নেমে পড়লেন। দক্ষ কারিগর ও দক্ষ কর্মচারী হাতের স্পর্শে অল্প সময়ের মধ্যে একটি নান্দনিক বিহার তৈরি করা হল। শুধু বিহার নয়, রাজকর্মচারী উত্তম সেবাপণ্যগুলোও জোগাড় করে সাজিয়ে রাখল অল্পদিনের মধ্যে। সব কার্যক্রম শেষ হলে রাজ্যের রাজকর্মচারী একটি চিঠি লিখে রাজপুত্রদের কাছে খবর পাঠালেন যে, আর্যপুত্রগণ আপনাদের আদেশ যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে এবং পবিত্র বর্ষাবাসের জন্য বিহারটি এখন পরিপূর্ণ।

রাজকর্মচারীর পাঠানো চিঠি পেয়ে বুদ্ধের তিনভাই মহাসমারোহে পূজা দিতে দিতে ফুস্য বুদ্ধকে নতুন তৈরি করা সেই বিহারে নিয়ে আসলেন। অতঃপর ফুস্য বুদ্ধের তিনভাই নিজেরা প্রব্রজ্যাধর্মে দিক্ষীত হয়ে এক হাজারেরও অধিক সেবকসহ নতুন তৈরি করা বিহারটি বুদ্ধসহ মহাভিক্ষুসংঘকে দান করে উৎসর্গ করলেন। তথাগত ফুস্যবুদ্ধ সশিষ্য ঐ নতুন বিহারে বর্ষাবাস অধিষ্ঠান করলেন।

ভগবান ফুস্য বুদ্ধের ভাইদের তথা রাজা জয়সেনের কোষাধ্যক্ষ বা খাজাঞ্চি ছিলেন এক গৃহপতি পুত্র। সেই খাজাঞ্চি ও তার স্ত্রী তারা দুইজনেই অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ও শ্রদ্ধাবতী। তারা বুদ্ধের প্রতি, ধর্মও সংঘের প্রতি খুবই প্রসন্ন পরায়ণ। তারা স্বামী-স্ত্রী দুইজনেই জানত যে বুদ্ধের, ধর্মও সংঘকে কিভাবে সেবা-পূজা করতে হয়। বুদ্ধের তিনভাইয়ের ও তাদের জ্ঞাতীও অনুসারীদের বা কর্মচারীদের তেমন একটা অভিজ্ঞতা ছিল না- বুদ্ধ, ধর্মও সংঘকে কিভাবে সেবা-পূজা করতে হয় বা কিভাবে দান করতে হয়। তাই খাজাঞ্চিও তার স্ত্রী তারা দুইজনেই মিলে তাদেরকে সবকিছু দেখিয়ে দিল, বুঝিয়ে দিল, কিভাবে দানীয় বস্তু সাজাতে হয়, কিভাবে খাবার পরিবেশন করতে হয়, কিভাবে ত্রিরত্নকে সেবা-পূজা করতে হয় ইত্যাদি।

বুদ্ধের তিনভাইদের জ্ঞাতীও কর্মচারীসহ মোট এগারো হাজার ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি দলপতি অর্থাৎ যিনি পরিচালক ছিলেন তিনি দান, সেবা ও পূজার বিষয়ে ভালো করে বুঝে নিয়ে সেখানে থাকা এগারো হাজার লোকদের সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধসহ মহাভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে সুস্থ, সুন্দর ও সফলভাবে দান কার্যক্রম সম্পাদন করলেন। এখানে বুদ্ধ প্রমুখ মহাভিক্ষুসংঘের সেবা নিযুক্ত হওয়ায় এগারো হাজার ব্যক্তি বা সেবকগণের মধ্যে সবাই যে বুদ্ধপ্রমুখ মহাভিক্ষুসংঘের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রসন্ন পরায়ণ ছিল তা কিন্তু নয়। বুদ্ধের সেবার কাজে নিযুক্ত হওয়া এগারো হাজার সেবকের মধ্যে একদল লোক ছিল ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ও অপ্রসন্ন। তারা ছিল বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ। এখানে যারা ত্রিরত্নের প্রতি অপ্রসন্ন ছিল তারা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত আহারগুলো বুদ্ধও ভিক্ষুসংঘকে দান দেয়ার পূর্বেই খেয়ে নিল। তারপর তারা হিংসাবশত, বিদ্বেষ, চিত্তপরায়ণ হয়ে, বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘ দান গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হোক, এই ভেবে এবং যারা ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন তাদের দানকার্যে অন্তরায় ঘটুক এই মনে করে তারা রান্নাঘরও খাবারঘর দুটোই আগুন ধরিয়ে দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল কিন্তু পালিয়ে গেলে কি হবে? কর্মের হাত থেকে তো আর পালানো সম্ভব নয়। এখানে যারা যারা বুদ্ধ প্রমুখ মহাভিক্ষুসংঘের প্রতি অপ্রসন্ন ছিল তারা মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই নরক বা নিরয়গামী হল। (নিরয়ে উৎপন্ন হল)। এদিকে বুদ্ধের তিনভাই ও অন্যান্য সেবকগণ, যারা ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন পরায়ণ ছিলেন। তারা প্রত্যেকেই বর্ষাবাসের তিনমাস পর্যন্ত বুদ্ধসহ ভিক্ষুসংঘকে সেবা-পূজা করার পর, বর্ষাবাস শেষ হলে- মহাসমারোহে বুদ্ধকে পিতার নিকট নিয়ে গেলেন। বুদ্ধ সেখানে যাওয়ার কিছুদিন পর পরিনির্বাপিত হলেন (কুশিনগর সেনারাম)। বুদ্ধের তিনভাই, জনপদে নিযুক্ত কর্মচারী গৃহপতি পুত্রসহ প্রমুখ, যারা ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন পরায়ণ ছিলেন তারা প্রত্যেকেই মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে উৎপন্ন হলেন। এদিকে যারা স্বর্গগামী হয়েছেন তারা স্বর্গ থেকে স্বর্গে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। অপরদিকে যারা নরকগামী হয়েছেন তারা এক নরক থেকে আরেক নরক পরিভ্রমণ করতে লাগলেন।

তারা এভাবে, বিপশ্যী বুদ্ধ, সিখী বুদ্ধ, বেস্যভূ বুদ্ধ, ককুসন্ধ বুদ্ধ, কোণাগমন বুদ্ধ এই পাঁচজন বুদ্ধের শাসনকাল পর্যন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করার পর বিরানব্বই কল্পের পরে বর্তমান এই ভদ্রকল্পে ভগবান কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনামলে প্রেতলোকে উৎপন্ন হলেন। অতঃপর এই ভদ্রকল্পে ভগবান কাশ্যপ বোধিসত্ত্ব সংসার ত্যাগ করে বুদ্ধ হলেন। তারপর ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করার পর দিকে দিকে ধর্মপ্রচার করতে লাগলেন। বুদ্ধের ধর্মবাণী শুনে বহু মানুষ দান-ধর্ম করতে লাগলেন এবং "এই দানের পুণ্যফল আমাদের জ্ঞাতীগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়ে তারা সুখী হোক" এই বলে মৃত জ্ঞাতীগণের উদ্দেশ্যে পুণ্যদান দিতে লাগলেন। তাদের মৃত জ্ঞাতীগণও অর্থাৎ তাদের জ্ঞাতী প্রেতগণ তাদের এই পুণ্য অনুমোদন করে সুখী হতে লাগলেন, তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত হচ্ছিল। সেসময় ফুস্য বুদ্ধের শাসনে দানীয় ভোগ করে রান্নাঘর ও খাবারঘর আগুন দিয়ে জালিয়ে দেওয়া লোকগুলো প্রেতকূলে উৎপন্ন হয়ে অতিশয় দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলেন। তখন তারা দেখতে পেল যে, অন্যান্য প্রেতগণ তাদের জ্ঞাতীগণের পুণ্যদান, পেয়ে সুখী হচ্ছে, অতঃপর তারা চিন্তা করল আমরাও সুখী হতে পারব কিনা এই সম্পর্কে আমরা বুদ্ধের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি।

তারপর তারা প্রত্যেকেই কাশ্যপ বুদ্ধের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। তখন তারা অত্যন্ত করুন কণ্ঠে বুদ্ধকে বলল, ভান্তে ভগবান- অন্য প্রেতগণ তাদের জ্ঞাতীগণের পুণ্যদান অনুমোদন করে সুখী হচ্ছে। তাদের মতন আমরাও লাভ করতে পারব কিনা? বা আমাদেরকে পুণ্যদান দেবে, পুণ্যদান দিয়ে সুখী করবে, এইরকম জ্ঞাতী আমাদের আছে কিনা? তাদের এই প্রার্থনার কথা শুনে-ভগবান কাশ্যপ সম্যক সম্বুদ্ধ দিব্যজ্ঞানে দেখলেন তাদের কোনো জ্ঞাতী তার শাসনে জন্মগ্রহণ করেনি। তাদের জ্ঞাতীরা বর্তমানে স্বর্গ থেকে স্বর্গে পরিভ্রমণ করছে। আবার দেখলেন– তারা কবে মনুষ্যলোকে জন্ম নেবে। তখন কাশ্যপ বুদ্ধ দেখতে পেলেন তার শাসনকাল শেষ হওয়ার পর জগতে "গৌতম সম্যক সম্বুদ্ধ" নামে একজন বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন। সেসময় তাদের জ্ঞাতীগণ স্বর্গলোক থেকে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে জন্ম নেবে। তাদের পুণ্যদানের মাধ্যমেই এই প্রেতগণ, প্রেতগণের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হবে।

এরপর কাশ্যপ বুদ্ধ ঐ প্রেতগণকে বললেন- তোমরা এখন পুণ্যসম্পত্তি লাভ করতে পারবে না। কারণ দান-ধর্ম করার পর যেই পুণ্য অর্জিত হয় সেই পুণ্যটুকু দান করবে এরকম জ্ঞাতী বর্তমানে তোমাদের কেউ নেই। ভবিষ্যতে জগতে গৌতম সম্যক সম্বুদ্ধ নামে একজন বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন। তার শাসনামলে বিম্বিসার নামে একজন রাজা রাজ্য পরিচালনা করবেন। সেই বিম্বিসারই হচ্ছে বিরানব্বই কল্প পূর্বের তোমাদের জ্ঞাতী। তিনি বর্তমানে স্বর্গে অবস্থান করছেন। তিনি মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে বুদ্ধ প্রমুখ মহাভিক্ষুসংঘকে দান দেওয়ার পর সেই পুণ্যটুকু তোমাদের উদ্দেশ্যে দান করলে আর তোমরা ও যদি সেই পুণ্য অনুমোদন করতে পার তবেই সেই পুণ্যলাভ করে তোমরা সুখী হতে পারবে,

এর আগে নয়। বুদ্ধের মুখ থেকে এই কথাটি শোনার পর প্রেতগণ খুবই খুশি হলেন এবং সেই দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এদিকে কাশ্যপ বুদ্ধের শাসন শেষ হয়ে বহু হাজার বছর পর জগতে আবির্ভূত হলেন গৌতম সম্যক সম্বুদ্ধ। তখন ফুস্য বুদ্ধের বৈমাত্রেয় তিনভাইও স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে মগধরাজ্যে (রাজগৃহে) এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন।

তারা বিরানব্বই কল্প পূর্বে ফুস্য বুদ্ধের সময়েও একই পরিবারের আপন তিনভাই ছিলেন। বর্তমানে গৌতম বুদ্ধের শাসনকালে ও একই ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে আপন তিনভাই হলেন। তারা যে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই ব্রাহ্মণ পরিবারের গোত্রের নাম ছিল কাশ্যপগোত্র। তাই তাদেরকে বা তাদের তিনভাইয়ের পরিচয় ছিল কাশ্যপ নামে। বড়ভাই হলেন উরুবেলা-কাশ্যপ, মেজভাই ছিলেন নদীকাশ্যপ, ছোটভাই হলেন গয়াকাশ্যপ। তাদের তিনভাইয়ের আবার মোট (১০০০) এক হাজার শিষ্যসংখ্যা ছিল। উরুবেলা কাশ্যপের পাঁচশত শিষ্য, নদী কাশ্যপের শিষ্যসংখ্যা তিনশত, গয়াকাশ্যপের শিষ্যসংখ্যা ছিল দুইশত। তাদের মধ্যে যিনি বড়ভাই ছিলেন মানে যার নাম ছিল উরুবেলা-কাশ্যপ তিনি পাঁচশত শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে শিষ্যদের সাথে উরুবেলায় অবস্থান করতেন তাই তার নাম হয় উরুবেলা-কাশ্যপ জটিল ব্রাহ্মণ বা ঋষি, যিনি মেজভাই যার নাম হচ্ছে নদী-কাশ্যপ, তিনি তিনশত শিষ্যসহ নৈরাঞ্জনা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করতেন বলে তার নাম হয় নদীকাশ্যপ জটিল ব্রাহ্মণ (ঋষি), আর যিনি ছোটভাই ছিলেন যার নাম গয়াকাশ্যপ, তিনি দুইশত শিষ্যসংঘ নিয়ে গয়ায় অবস্থান করতেন বলে তার নাম হয় গয়া-কাশ্যপ জটিল ব্রাহ্মণ বা ঋষি। ফুস্য বুদ্ধের ভাইয়েরা স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে মগধরাজ্যে জন্মগ্রহণ করে পূর্ণ বয়স হলে এভাবে তিনও ভাই ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে যারযার মত করে সুখে অবস্থান করতে লাগলেন। আর এদিকে ফুস্য বুদ্ধকে সেবা করার জন্য যিনি নিযুক্ত প্রধান কর্মচারী ছিলেন তিনি স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে রাজগৃহ নগরে রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে পরে বিম্বিসার রাজা হলেন। আর যিনি রাজ ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়ের হিসাবরক্ষক ছিলেন (কোষাধ্যক্ষ বা খাজাঞ্চি) তিনি স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে গৌতম বুদ্ধের শাসনামলে হয়েছিলেন বিশাখ শ্রেষ্ঠী। আর তার অতীত জন্মের স্ত্রী হয়েছিলেন শ্রেষ্ঠীকন্যা ধর্মদিন্না। আর বাদবাকী ফুস্য বুদ্ধকে যারা সেবক হিসেবে সেবা করেছিলেন তারা বিম্বিসার রাজার রাজ পরিষদ হয়েছিলেন।

গৌতম সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করে বুদ্ধত্ব লাভ করার পর সাতটি মহাস্থানে সাত সপ্তাহ অতিবাহিত করার পর শিষ্যগণকে ধর্মদেশনা দেবার জন্য বারাণসীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বুদ্ধ সারানাথ যাবার পর সেখানে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগণের উদেশ্যে ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করলেন। পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগণ একে একে প্রত্যেকেই যখন অর্হত্ত্বফল লাভ করলেন তখন বুদ্ধ তাদেরকে সঙ্গে

নিয়ে যশ শ্রেষ্ঠীর উদ্যানে গেলেন। সেখানে যশকে অর্হত্বফলে প্রতিষ্ঠাপিত করার পর যশের বন্ধু-বান্ধব যারা ছিলেন তাদেরকেও ধর্মদান দিয়ে অর্হত্বে উন্নীত করালেন এবং বাদবাকীদের ধর্মজ্ঞানে জ্ঞানী করে শিষ্য সংঘ পরিবৃত হয়ে বুদ্ধ উরুবেলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বুদ্ধ উরুবেলায় গিয়ে তিন জটিল ব্রাহ্মণকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের শিষ্যসহ তাদেরকে ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষিত করালেন। তারপর বুদ্ধ হাজারেরও অধিক শিষ্যসংঘ সঙ্গে নিয়ে রাজগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ভগবান বুদ্ধ রাজ গৃহে উপস্থিত হয়ে যষ্টিবন নামে একটি বাগানে অবস্থান করতে লাগলেন। সেই যষ্টিবনে একটি বটবৃক্ষমূল ছিল। দেখতে খুবই সুন্দর পরিবেশও বেশ আরামদায়ক। বুদ্ধ সেই বটবৃক্ষমূলে অবস্থান করতেন। এই যষ্টিবন/লাঠিরবনটি ছিল একটি তালবাগান। সেই তালবাগানে স্ত্রীতালগাছের চেয়ে পুরুষ তালগাছ বেশি ছিল। যে তালগাছে তালফল হয় ঐ তালগাছটি স্ত্রীতালগাছ। আর যে তালগাছে তালফল না হয়ে শুধু কিছু গুচ্ছদণ্ড বের হয় সেগুলোই হচ্ছে পুরুষ তালগাছ। সেই তালবাগানে এই ধরনের গুচ্ছদণ্ড বের হওয়া তালগাছ বেশি ছিল বলে লোকজন ঐ তাল বাগানকে লাঠিরবন বলত।

তখন বিম্বিসার রাজা তার দূতের কাছ থেকে শুনতে পেলেন যে, ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহ নগরে এসে তার রাজ্যের অধীনে থাকা তালবাগানে অবস্থান-করতেছেন। এই খবরটি পেয়ে বিম্বিসার রাজা আর দেরী করলেন না, তিনি সঙ্গে একলক্ষ বিশ হাজার মগধবাসী নিয়ে বুদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য চলে গেলেন। তখন বুদ্ধ তাল বাগানে একটি বটবৃক্ষমূলে বসে আছেন। বিম্বিসার রাজা পরিষদ বর্গসহ ভগবান বুদ্ধকে বন্দনা করলেন। তারপর বুদ্ধ তাদের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। ধর্মদেশনা শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিম্বিসার রাজাসহ সাথে যারা বুদ্ধ দর্শনে গিয়েছিলেন তারা প্রত্যেকেই স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। বিম্বিসার রাজা ধর্মচক্ষু লাভকরার পর পরদিনের জন্য বুদ্ধসহ প্রমুখ মহাভিক্ষু সংঘকে ফাং করলেন।

পরের দিন ভগবান বুদ্ধ মহাভিক্ষুসংঘসহ রাজবাড়িতে যথাসময়ে উপস্থিত হলেন। বিম্বিসার রাজা বুদ্ধসহ প্রমুখ মহাভিক্ষুসংঘকে উত্তম উত্তম খাদ্য বস্তু দ্বারা নিজেই পরিবেশন করে পরিতৃপ্ত করে প্রশংসার ভাগীদার হলেন। এদিকে বিম্বিসার রাজার বিরানব্বই কল্প পূর্বের জ্ঞাতীগণ বা প্রেতগণ জানতে পারলেন যে ভগবান বুদ্ধ তাদের জ্ঞাতী বিম্বিসারের রাজ বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছেন বা নিমন্ত্রণ পেয়েছেন।

বিনয়পিটকের মহাবর্গের টীকা বিম্বিসার রাজার দীক্ষা পর্বটি দেখুন।

এই খবর পেয়ে তারা প্রত্যেকেই পুণ্যদান পাওয়ার আশায় রাজ বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। ঐ প্রেতগণের একটিমাত্র চিন্তা ছিল বুদ্ধ যখন আমাদের জ্ঞাতীর বাড়িতে এসেছেন তাহলে আজকে আমরা অবশ্যই পুণ্যদান লাভ করব। এই পুণ্য পেয়ে আমরা সুখী হতে পারব। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে- বিম্বিসার রাজা বুদ্ধ প্রমুখ মহাভিক্ষুসংঘকে খাদ্য-ভোজ্য, লেহ্য, পেয়া দ্বারা দান দেবার পর তিনি আর কিছু করলেন না। তিনি ডুবে গেলেন গভীর এক চিন্তায়। তার চিন্তাটি ছিল এইরকম ভগবান বুদ্ধ প্রথমবার রাজগৃহে এসেছেন তিনি এখন কোথায় অবস্থান করবেন? বিহার বা কুটির কোথায় তৈরি করে দেবেন? কোন জায়গাটিই বা ভগবান অবস্থানের জন্য উপযুক্ত স্থান?

রাজা এসব চিন্তায় বিভোর ছিলেন বলে পুণ্যদান বা উৎসর্গ কিছুই করলেন না। এদিকে তার জ্ঞাতীপ্রেতগণ দেখলেন যে রাজা দান-ধর্ম করেছেন ঠিকই কিন্তু তাদের জন্য তো কিছুই করলেন না। তারা যেটা পাওয়ার আশায় রাজবাড়িতে উপস্থিত হয়েছিল, তারা দেখল সেই আশা-ভরসা বৃথা গেল। তখন তারা খুবই দুঃখিত হল, তাদের অন্তরে রাজার প্রতি ক্ষোভ উৎপন্ন হল। তারা সেদিন রাজবাড়ি ত্যাগ করল না, তারা কেবল অপেক্ষা করতে লাগল যে, রাজবাড়ি কখন শান্ত হবে, সবাই কখন ঘুমাবে। এদিকে দিনের আলো গড়িয়ে রাত নেমে এল, তারপর খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ল রাত যখন গভীর হল তখন বিম্বিসার রাজার জ্ঞাতীপ্রেতগণ ভয়ঙ্কর শব্দ করা আরম্ভ করল। এসব বিষয় শোনার পর সেদিন বা সেই রাতে বিম্বিসার রাজা আর ঘুমাতে পারলেন না। তিনি ভয়ে ভয়ে রাত কাটিয়ে দিলেন। অতঃপর বিম্বিসার রাজা ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ভগবান বুদ্ধের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। (প্রিয় পাঠকবৃন্দ, বিম্বিসার রাজার বেনুবন বা বাঁশ বাগানটি দান করার বিষয়ে বিনয় পিটক মহাবর্গে পাবেন। সেখানে বা ত্রিপিটকে যেহেতু আছে তাই আমি আর এখানে উপস্থাপন করলাম না)। যাহোক, তখন ভগবান বুদ্ধ বেনুবন বিহারে ছিলেন। বুদ্ধ রাজা বিম্বিসারকে অতি ভোরে বিহারে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন মহারাজ অতি প্রত্যুষে এখানে আসার কারণ কী?

ভগবান বুদ্ধের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে গতরাতে যা যা হয়েছিল রাজা বুদ্ধকে জ্ঞাপন করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, ভান্তে ভগবান! এই উপদ্রবের ফলে আমার কোনো ক্ষতি হবে কিনা? কোনো অমঙ্গল কিছু ঘটবে কিনা? তখন ভগবান বুদ্ধ বললেন– মহারাজ ভয় পাবেন না এর মাধ্যমে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না আর অমঙ্গলও কিছুই হবে না। বরঞ্চ আপনার মঙ্গলই হবে। আপনি যে শব্দটি শুনেছেন সেটি আপনার জ্ঞাতীগণেরই শব্দ। তারা পূর্বে আপনার জ্ঞাতী ছিল। এখন প্রেতলোকে উৎপন্ন হয়ে দুঃখে দিনাতিপাত করছে। তারা বহুকাল ধরে আপনার পুণ্যদানের জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি যখন বুদ্ধসহ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান দিয়েছিলেন তখন তারাও রাজবাড়িতে উপস্থিত ছিল। তারা মনে মনে চিন্তা করতেছিল রাজা বুদ্ধকে দান দিয়েছেন,

মনে হয় এখনই আমাদের উদ্দেশ্যে পুণ্যদান দেবেন, এই এখনই দেবেন, এই চিন্তা নিয়ে তারা শুধু আপনার দিকে তাকিয়ে (দৃষ্টি) রয়েছিল কিন্তু আপনি তাদের উদ্দেশ্যে পুণ্যদান না দিয়ে তাদেরকে নিরাশ করেছেন। তাই তারা আপনাকে ভয় দেখানোর জন্য, তারা যে রাজবাড়িতে আছে এটা বুঝানোর জন্য বিকটভাবে চিৎকার করেছে। বুদ্ধের এই কথা শুনে বিম্বিসার রাজা খুবই দুঃখিত হলেন। অতঃপর বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন ভান্তে ভগবান-যে পুণ্যাংশ আমার ভুলের কারণে দেওয়া হয়নি, এখন সেই পুণ্যের অংশ দান করলে তারা লাভ করতে পারবেন কিনা?

বুদ্ধ বললেন- হ্যাঁ মহারাজ, সেই পুণ্যের অংশ তারা অবশ্যই লাভ করতে পারবে। বুদ্ধের এই বাক্য শ্রবণ করে বিম্বিসার রাজা অত্যন্ত খুশি হলেন। অতঃপর তিনি বুদ্ধসহ ভিক্ষুসংঘকে দুপুরবেলা আহারের জন্য আবার ফাং করলেন (নিমন্ত্রণ)। তারপর রাজা বেনুবন বিহার থেকে রাজবাড়িতে চলে গেলেন। তিনি রাজবাড়িতে যাওয়ার পর দানীয়বস্তু সংগ্রহ করলেন এবং বুদ্ধসহ মহাভিক্ষুসংঘের জন্য বসার আসন তৈরি করে দিলেন। সেদিন দুপুরের আহার করার সময় হলে যথাসময়ে ভগবান বুদ্ধও মহাভিক্ষুসংঘ রাজবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘরা রাজবাড়িতে উপস্থিত হয়ে সকলেই যার যার আসনে বসে পড়লেন। অতঃপর বিম্বিসারের জ্ঞাতীপ্রেতগণ চিন্তা করলেন– আবার যেহেতু বুদ্ধ রাজবাড়িতে আগমন করেছেন তাহলে আজকে নিশ্চয়ই আমরা পুণ্যফল লাভ করব। তারা এই চিন্তা করে বিম্বিসার রাজার রাজবাড়িতে উপস্থিত হলেন। তখন ভগবান বুদ্ধ এমন ‘ঋদ্ধি প্রসারিত করলেন যে, সেখানে উপস্থিত সমস্ত জ্ঞাতীপ্রেতগণকে স্পষ্ট (পরিষ্কারভাবে) দেখতে পেলেন রাজা। বিম্বিসার রাজা তার জ্ঞাতীগণের দুঃখ-দুর্দশা দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন, অহো! আমার জ্ঞাতীগণ কতোই না দুঃখে দিন যাপন করছে। তারপর দুপুরের আহারের সময় হলে বিম্বিসার রাজা বুদ্ধের হাত ও পাত্র ধোয়ার জন্য (ধৌত) জল ঢেলে দিলেন এবং মনে মনে বললেন– এই পুণ্যের ফল আমার জ্ঞাতীগণের কাছে উৎপন্ন হোক। রাজা এভাবে পুণ্যদান দেয়ার সাথে সাথে জ্ঞাতীগণের সামনে পদ্মফুল সমৃদ্ধ পরিষ্কার একটি পুকুর উৎপন্ন হল। পুকুরের চারপাশে পদ্মফুল, প্রস্ফুটিত হয়েছে। রাজার জ্ঞাতীপ্রেতগণ সেই পুকুরে নেমে স্নান করলেন এবং তাদের কল্প-কল্পান্তর ধরে যে পানির তৃষ্ণা ছিল সেই পুকুর থেকে পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করল। তখন তাদের দেহবর্ণ-স্বর্ণময় দেখা দিল।

তারা হলেন স্বর্গের দেব দেবীর সমতুল্য। এসব ঘটনাগুলো রাজা দেখতে লাগলেন। কারণ তখনও ভগবান বুদ্ধ ঋদ্ধি ছেড়ে দেননি। তারপর রাজা বুদ্ধসহ প্রমুখ মহাভিক্ষুসংঘকে উত্তম উত্তম খাদ্যভোজ্য পরিবেশন করলেন এবং সেই পুণ্যটুকুও তিনি জ্ঞাতীগণের উদ্দেশ্যে দান করলেন। রাজার জ্ঞাতীগণ সেই পুণ্য লাভ করে স্বাস্থ্যবান হলেন। অতঃপর রাজা বস্ত্র,

বিছানা, চাদর ও পালঙ্কসহ একজন ব্যক্তির নিত্য ব্যবহারের জন্য যেসব জিনিস প্রয়োজন হয় সব কিছু দান করে দিলেন। তখন বিম্বিসার রাজার জ্ঞাতীগণ সবকিছু লাভ করার পর তাদের শরীর থেকে দিব্য জ্যোতি বের হতে লাগল। বিম্বিসার রাজা এসব দেখার পর খুবই সন্তুষ্ট হলেন। দেহের ভারটা কমে গেল তার, আর তিনি হলেন মুগ্ধ, হলেন পরিতৃপ্ত। তারপর বিম্বিসার রাজার জ্ঞাতীগণ বিরানব্বই কল্প ধরে যে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে এসছিলেন এতকাল ধরে, সেদিন রাজার পুণ্যদান লাভ করার পর এখন তারা হলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। রাজার প্রতি তারা হলেন কৃতজ্ঞ, তারা তখন আর প্রেতলোকের বাসিন্ধা নয় তখন তারা হলেন স্বর্গীয় সুগতি ভূমির বাসিন্দা।

এরপর ভগবান বুদ্ধসহ প্রমুখ মহাভিক্ষুসংঘের দুপুরের আহার করা শেষ হলে বিম্বিসার রাজার দান অনুমোদন করার জন্য ভগবান বুদ্ধ তিরোকুড্ড বা তিরোকুট্ট প্রেতকাহিনী দেশনা করে নিম্নের এই সূত্রটি ভাষণ করলেন– তিরোকুড্ড সূত্রের পালিটি যেহেতু প্রত্যেক বন্দনা বইয়ে দেয়া থাকে, তাই পালি সূত্রটি আমি এখানে উল্লেখ না করে শুধুমাত্র সূত্রের বাংলার অর্থটি তুলে ধরলাম। সূত্রের মূল পালির অর্থ বন্দনা বই থেকে দেখে নেবেন।

তিরোকুড্ড সূত্র বাংলা

১। প্রেতগণ পুণ্য লাভের আশায় স্বীয় নিজের জ্ঞাতীগণের ঘরের দেয়ালে ও ঘরের বাইরে, তিন বা চাররাস্তার মাথায় (রাস্তার সংযোগ স্থানে বা রাস্তার মুখে), ঘরের বাইরের কোণে, ঘরের মূল দরজার দুই পাশে অথবা ঘরের সীমানায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে।

২। প্রেতগণের পূর্বজন্মের দানজনিত পুণ্যের ফল না থাকায়, দান - ধর্মে অন্তরায় করার অকুশলজনিত কর্মফলের কারণে– মাতা - পিতা - পুত্র - কন্যা ও জ্ঞাতীগণের কাছে বিপুল পরিমাণ অন্ন-পানীয় বা খাদ্যদ্রব্য থাকার পরও তাদেরকে কেউ স্মরণ করে না অথবা স্মরণ করার ইচ্ছাও উৎপন্ন হয় না।

৩/৪। জীবিত জ্ঞাতীগণের মধ্যে যিনি পরলোকগত জ্ঞাতী বা প্রেতদের প্রতি অনুকম্পকারী হন বা তাদের প্রতি, দয়া-মায়া-করুণা উৎপন্ন করে, তাদের কৃতজ্ঞতার কথা ভেবে তিনি মাঝেমধ্যে উত্তম উত্তম খাদ্য-দ্রব্য, বস্ত্র যা নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু বা জিনিসপত্র দান দেয়ার পর এইরূপভাবে পুণ্যদান করে থাকেন। যেমন– আমার অর্জিত পুণ্যের ফল আমার জ্ঞাতীপ্রেতগণের মধ্যে উৎপন্ন হোক, বা তাদের কাছে গিয়ে উৎপন্ন হোক, আমার এই পুণ্যের ফল লাভ করে তারা সুখী হোক।

৫। জ্ঞাতীপ্রেতগণ ও জীবিত জ্ঞাতীর বাড়িতে উপস্থিত থেকে কর্ম ও কর্মফলকে গভীরভাবে বিশ্বাস করে এবং নিজেদের হিতসুখ মঙ্গলের জন্য জ্ঞাতীগণের দেয়া পুণ্যদানটুকু অনুমোদন করে থাকেন। জ্ঞাতীপ্রেতগণ পুণ্যদান লাভ করার পর তারাও জীবিত জ্ঞাতীগণের প্রতি এরূপ কল্যাণ কামনা করে থাকেন- আমরা যাদের মাধ্যমে এই দিব্যসম্পত্তি লাভ করেছি, আমাদের সেই অনুকম্পকারী বা কল্যাণকামী জ্ঞাতীগণও চিরজীবী হোক, আয়ু, বর্ণ, সুখ ও বল লাভ করে সুখী হোক।

৬। ওই প্রেতলোকে কোনো কৃষিকাজ নেই, গরু পালনের ব্যবস্থাও নেই, ব্যবসা - বাণিজ্যও নেই, সোনা - দানা, হীরা - মণিমুক্তাও জহরতের আমদানি - রপ্তানি করার ব্যবস্থাও নেই, যেটার মাধ্যমে প্রেতগণ জীবনধারণ করতে পারে এই রকম প্রেতলোকে কোনো ব্যবস্থা নেই, তারা কেবল মানুষের দেয়া বা জ্ঞাতীগণ কর্তৃক দানকৃত পুণ্যের মাধ্যমেই জীবনধারণ করে থাকেন।

৭। বৃষ্টি হলে যেমন উচ্চস্থান হতে জল নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়ে যেরূপ নিম্নভূমিতে বা স্থানে পৌঁছে যায়, সেইরূপ জ্ঞাতীগণের দেয়া বা মানুষের দেয়া দান-পুণ্যও জ্ঞাতীপ্রেতগণের কাছে পৌঁছে গিয়ে বা উৎপন্ন হয়ে তারা উপকৃত হয়ে থাকে।

৮। যেমন পরিপূর্ণ নদ-নদীর জল প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে সমুদ্রকে পরিপূর্ণ করে তোলে, সেইরূপ জ্ঞাতী মানুষদের দেয়া দান - পুণ্যের ফল

জ্ঞাতীপ্রেতগণকে উপকার করে থাকে।

৯। তারা আমার মাতা - পিতা বা জ্ঞাতী - মিত্র, বন্ধু - বান্ধব ছিল, তাদের কষ্টে অর্জিত ধন-সম্পত্তিগুলো সব আমাদেরকে দিয়েগেছেন, তারা কিছুই নিতে পারেননি। এভাবে তাদের করে যাওয়া উপকারের কথা স্মরণ করে দান-ধর্ম করার পর সেই পুণ্যটুকু তাদের উদ্দেশ্যে দান করে দেয়া উচিত।

১০। যারা জ্ঞাতীর মৃত্যুতে দান ধর্ম করে না, বিবিধ কুশল কর্ম ও করে না, তাদের উদ্দেশ্যে ও পুণ্যদান দেয় না, কেবল কান্নাকাটি (কান্না করে করে সময় পার করা) করে সময় অতিবাহিত করে এর মাধ্যমে জ্ঞাতীপ্রেতদের কোনো উপকার হয় না।

রাজা বিম্বিসারের স্বীয় কৃত (নিজের করা) দান সম্পর্কে বুদ্ধের উপদেশ :

১০। এই দান উত্তম সংঘক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে, উর্বর জমিতে উত্তম বীজ বপিত হয়েছে, এই দানের পুণ্যের ফল প্রেতগণের দীর্ঘকাল হিতের জন্য, সুখের জন্য, মঙ্গলের জন্য, তৎক্ষণাৎ ফল প্রদান করে। এর দ্বারা দাতা দীর্ঘকাল সুখ লাভ করবেন।

১১। জ্ঞাতীপ্রেতদের উদ্দশ্যে দান দিলে তা পুণ্যদান প্রদান করলে, মৃত জ্ঞাতীগণও উপকৃত হয়। আর দান দাতারও জ্ঞাতীধর্ম রক্ষা করা হয়। এর দ্বারা দানপুণ্যে ও কুশল কর্মজনিত পুণ্যদান দ্বারা প্রেতদের ও মহৎ পূজা করা হয়। ভিক্ষুসংঘকে ও আহারের বল বা শক্তি প্রদান করা হলো, আর দান দাতার দ্বারা বহুপুণ্য, অপরিমেয় পুণ্য সঞ্চিত হলো।

ভগবান বুদ্ধ রাজা বিম্বিসারকে এরূপ ধর্মদেশনা প্রদান করার পর দেশনা শেষ করে দান অনুমোদন করার পর রাজ প্রসাদ থেকে বেনুবনে চলে গেলেন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ- এখানে, কেবল একটি বিষয় কেন্দ্রীভূত থাকলো না, এখানে বেশ কয়েকটি বিষয় যোগ হয়েছে, আর এখান থেকে অনেক কিছু শেখার ও আছে- এই কাহিনী উৎপত্তির মূল গোড়া হচ্ছে বিরানব্বই কল্প পূর্বে ফুস্যবুদ্ধের সময়কালে। তখন একদল লোক হিংসা, বিদ্বেষ (রাগ) ও লোভবশত দান দেয়ার পূর্বে দানীয় বস্তু ভোগ করে, পাকঘর ও ভোজনশালা আগুন ধরিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে পাঁচজন বুদ্ধের শাসনকাল পর্যন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে পার করে দিয়েছে। (৬) ছয়জন বুদ্ধের শাসনকালে এসে তারপর ঐ দুঃখ থেকে মুক্ত হল। আমি শুরুতে একটি কথা বলেছিলাম বুদ্ধ বলেছেন- রাগের সমান অগ্নি বা আগুন নেই, তৃষ্ণা (পার্থিব জগতে ভোগবিলাস করা) সমান নদী বা জল নেই। তাই যথাসম্ভব প্রত্যেকের রাগ কন্ট্রোল করা উচিত। আর এই কাহিনী দ্বারা বর্তমান বুদ্ধশাসনে বিম্বিসারের ঐ সংঘদানের মাধ্যমে (১ম) প্রথম সংঘদানের উৎপত্তি ঘটছে। আর বর্তমান বুদ্ধ শাসনে প্রথম বিহার দান করা হয়েছেও রাজা বিম্বিসারের মাধ্যমে। এইখান থেকে অনেক কিছু শেখার ও বুঝার আছে। এখানে আর কিছু যোগ করলাম না বাদবাকী ত্রিপিটক থেকে দেখে

নিয়েন। অন্তরের অগ্নির খনি নির্বাপণ হয়েছে- কাহিনীও এখানে সমাপ্ত হলো।

বি.দ্র. বিম্বিসার রাজার জ্ঞাতীগণের অতীতে লোভ, দ্বেষ ও মোহ করার ফল এখন উপশম হয়েছে এটা বুঝাতে গিয়ে 'অগ্নির খনি' শব্দটি ব্যবহার করেছি। কারণ খনির ভেতরে ভেতরে রত্ন উৎপাদন হয় যা বাইরে থেকে সহজে দেখা যায়না, মানুষের অন্তরের লোভ, দ্বেষ, মোহও ভেতরে ভেতরে সত্ত্বগণকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খায় যেটা চর্মচক্ষু আর সাধারণ মন দ্বারা বুঝা কঠিন)

মানবের মাঝে দেবলোক বৈশালীনগরের করুণ দৃশ্য

বৈশালীনগরের অপরূপ সৌন্দর্যের কথা "বৈশালীনগরের উৎপত্তি ও লিচ্ছবি বা বজ্জি জাতির উৎপত্তির" আলোচনা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছি। যেহেতু পরবর্তীতে আলোচনা করা তাই আমি আবার এখানে সেই বিষয়ে আলোচনা করতে চায় না। আমি এই পর্বে লিচ্ছবিদের গুণজ্ঞানের বিষয়ে আলোচনা করব।

মহাপরিনির্বাণ লাভ করার পূর্বে ভগবান বুদ্ধ কোটি গ্রামে আম্রপালির আমবাগানে অবস্থান করার সময় ভিক্ষুসংঘদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন- হে ভিক্ষুগণ! তোমরা এখনও যারা তাবতিংস স্বর্গের দেবতাদের দেখনি তারা ঐ লিচ্ছবি পরিষদকে দেখ, লিচ্ছবিদের তাবতিংস দেবতাদের সঙ্গে তুলনা কর। বুদ্ধ কি অর্থে ওখানে লিচ্ছবিদের তাবতিংস দেবতাদের সমতুল্য বলেছেন? লিচ্ছবিগণ তাবতিংস স্বর্গের দেবগণের ন্যায় কেন এত প্রশংসা ভাজন হয়েছেন? সমগ্র পৃথিবী জুড়ে কিভাবে ও কোথায় গণতন্ত্র চালু হয়েছে, কারা এই গণতন্ত্র চালু করেছেন বা উৎপত্তি ঘটিয়েছেন? পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় পাতায় বৈশালীনগরের ইতিহাস এত জায়গা করে নেয়ার কারণ কী? আমরা সবকিছু জানবো এই পর্বে।

পৃথিবীর ইতিহাসে আলোচিত-সমালোচিত একটি নাম হচ্ছে বৈশালী। এই বৈশালীনগর পুরো বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছে। বৈশালীনগরের মানুষ তথা লিচ্ছবিগণ দেখিয়ে দিয়েছেন যে, একতায় শক্তি, একতায় বল। আবার প্রাচীন ভারতের ষোলটি নাম করা জনপদের মধ্যে অন্যতম একটি জনপদ হচ্ছে এই বৈশালী। লিচ্ছবিগণ ছিলেন খুবই ক্ষমতাসীন। তাদের সুনাম - যশ - খ্যাতি ছিল উজ্জ্বল নক্ষত্রের সমতুল্য। তাদের রূপ এতই সুন্দর ছিল যে যেকোনো ব্যক্তিকে ভাবিয়ে তুলতে সক্ষম। বৈশালীনগরের লিচ্ছবিগণ নারী- পুরুষ সকলেই অতুলনীয় রূপসম্পন্ন ছিলেন। তারা ছিলেন স্বাস্থ্যের দিকেও উন্নত, আচার-আচরণও খুবই মনোরম। এই বৈশালীনগর কয়েকটি কারণে বিখ্যাত হয়েছিল। (১ম) প্রথম কারণ হচ্ছে তাদের একতাবদ্ধতা জীবনযাপন। (২য়) দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে বৈশালীনগরের অনিন্দ্যসুন্দরী, নৃত্য-গানে, তালে, বিবিধ বিদ্যাকলায় পরিপূর্ণ একনাম আম্রপালি। (৩য়) তৃতীয় কারণ হচ্ছে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, (৪র্থ) চতুর্থ কারণ হচ্ছে তারা খুবই উৎসবপ্রিয়, (৫ম) পঞ্চম কারণ হচ্ছে তারা রত্ন-খচিত পোশাক-আশাক পরিধান করতে পছন্দ করতেন, (৬ষ্ঠ) ষষ্ঠ কারণ তারা এতই আনন্দ-উল্লাসপ্রিয় ছিলেন যে, বোঝানো মুসকিল। তারা বিবিধ রত্নদ্বারা তাদের ঘর-বাড়ি বা প্রাসাদগুলো সাজিয়ে রাখতেন। বৈশালী লিচ্ছবিগণ খুবই সৌন্দর্যপ্রিয় ছিলেন। তারা শুধু এসব কারণে বিখ্যাত নয়, তাদের বিখ্যাত হওয়ার অন্যতম দুটি কারণ রয়েছে-

১. নাম্বার কারণ হচ্ছে সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মতা আচরণ করা, অর্থাৎ যে আচরণটি করলে একটি দেশ, একটি গ্রাম, একটি নগর, একটি পরিবার কোনোদিন অবনতির দিকে যায় না, কোনোদিন পরাজিত হয় না, বরঞ্চ চতুর্দিকে দ্রুত উন্নতি লাভ করে থাকে।

২. নাম্বার কারণ হচ্ছে- বিখ্যাত নগরগণিকা আম্রপালি। প্রাচীনকালে বৈশালীনগরে যে সমস্ত বণিকগণ বা ব্যবসায়ীগণ বাণিজ্য করার জন্য বৈশালীতে পদার্পণ করেছিলেন তারা প্রত্যেকেই– আম্রপালির নাচ-গান ও রূপ দেখে অভিভূত না হয়ে থাকতে পারেননি। এ সমস্ত কারণে বৈশালীনগর দেবলোক বা দেবনগর বা তাবতিংস স্বর্গলোক বলে পরিচিতি লাভ করেছিল।

লিচ্ছবিগণ শুধু রূপেগুণে-সৌন্দর্যের মহিমান্বিত ছিলেন তা কিন্তু নয়, তারা ছিলেন মনের দিক থেকেও সুন্দর, ধার্মিক ও করুণা-পরায়ণ। তারা অপরের দুঃখে-দুঃখিত হয়ে অপরকে সেই দুঃখ থেকে উদ্ধার করার জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালাতেন। তারা বুদ্ধের প্রতি, ধর্মের প্রতি ও সংঘের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাবান ছিলেন। লিচ্ছবিগণের মনের উদারতা বুঝার সুবিধার্থে নিচে একটি কাহিনী বর্ণিত হল–

বুদ্ধের সময়কালে বৈশালীনগর ছিল বহুধন সম্পদে পরিপূর্ণ। রাস্তাঘাট ছিল সমান, সবসময় পূর্ণিমা- অমাবস্যা ও অষ্টমী তিথিতে তারা নানারকমের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। রাস্তার দুই পাশে সবসময় পতাকা ও মঙ্গলঘট বসানো থাকত। সেই বৈশালীনগরে সাত হাজার, সাতশত, সাতজন ক্ষত্রিয় রাজা পালাক্রমে রাজত্ব করে এসেছেন বা করে গেছেন। তাদের বসবাস করার জন্য বৈশালীনগরের সকল ক্ষত্রিয়দের ছিল সমপরিমাণ প্রাসাদ (সবগুলো প্রাসাদ দেখতে একিরকম ছিল), সমপরিমাণ কূটাগার (সবগুলো ঘর চূড়াযুক্ত-তিনকোণ বিশিষ্ট ছিল, একতলা থেকে তিনতলা বা সাততলা বিশিষ্ট ঘর), তাদের ছিল সমান সমান অপরূপ সৌন্দর্যময় উদ্যান বা বাগান, সেখানে ছিল সমান সমান বিশ্রাম করার জন্য কারুকার্য খচিত নান্দনিক ঘর, ফুলের বাগান, যেসব বিষয় দেখলে মন প্রফুল্ল হয়, মন খুশি হয় অর্থাৎ তাদের প্রকৃতিকে উপভোগ করার মত দর্শনীয় স্থান ছিল এবং সমপরিমাণ বা সমান সমান সৌন্দর্যশালী পুকুর ছিল, সেই পুকুরে ছিল রং-বেরং-এর পদ্মফুল। তখন বৈশালী ছিল সকল দিকে পরিপূর্ণ, কোনো দিকে অভাব ছিল না। এসব থাকার পরও একসময় বৈশালীনগরে দুঃখ-দুর্দশার কালো ছায়া গ্রাস করেছিল। তখন দেখা দিল চতুর্দিকে বেদনাদায়ক মর্মান্তিক হাহাকার। এই বেদনা সহ্য করা যায় না, যেদিকে চোখ যায় সেদিকে শুধু করুণদৃশ্য ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। বৈশালীনগরে দেখা দিল অনাবৃষ্টি। বৃষ্টি না হওয়ায় পানির অভাবে ক্ষেত-ক্ষেতি, ফসলাদি শুকিয়ে মরে যেতে শুরু করল, অনাবৃষ্টির কারণে মাটি শুকিয়ে গেল, দেখা দিল খড়া। তখন পানির অভাবে ফসলাদি উৎপাদন না

হওয়ায় বৈশালীনগরে (খাদ্যসংকট) খাদ্যশস্যের অভাব দেখা দিল, খাদ্যের অভাবে, পানির অভাবে প্রথমে গরীবরা মরতে শুরু করল, তারপর মধ্যবিত্তরা, তারপর উচ্চবংশীয়রা, এভাবে খাদ্য ও পানীয় অভাবে মানুষ মরতে মরতে একসময় মৃতদেহ সৎকার করার মতোও পরিস্থিতি থাকল না, তখন মানুষ এতটাই মরতে শুরু করেছিল যে, সেই মৃতদেহগুলো সৎকার করার জন্য মানুষের অভাব দেখা দিল। তারপর সেই মৃতদেহগুলো সৎকারের অভাবে এখানে সেখানে পড়ে থাকল। সেই মৃতদেহগুলো পচে গিয়ে পচা দুর্গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পরিশুদ্ধ বাতাসকেও কম্পিত করে দিল। তাদের সেই পচা দুর্গন্ধ পেয়ে বৈশালীনগরে অমনুষ্যগণ প্রবেশ করল। তখন নগরে দেখা দিল অমনুষ্যের উপদ্রপ। অতঃপর অমনুষ্যের উপদ্রবের কারণে বহুলোক মারা গেল। অমনুষ্যেরা নগরে প্রবেশ করায় তখন আরও অধিক পরিমাণে অসহ্য পচা দুর্গন্ধ আকাশে-বাতাসে প্রবাহিত হতে লাগল। তখন বাতাসে ঘুরে বেড়ানো পচা-দুর্গন্ধ সহ্য করতে না পেরে মানুষের মধ্যে দেখা দিল অদ্ভুত এক ধরনের রোগ। যার নাম হচ্ছে– অহিবাতরোগ। বর্তমানে যাকে 'প্লেগ' রোগ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। যে রোগটি হলে মানুষের শরীরের গ্রন্থিগুলো ফুলে গিয়ে টানটান হয়। সাপের (সর্প) কামড়ে যেভাবে দ্রুতগতিতে সারা শরীরে বিষ প্রবাহিত হয়, ঠিক সেরকম অতিবাতরোগও সারা শরীরে বিষের বাতাস প্রবাহিত হয়ে পুরো শরীরকে যন্ত্রণাময় করে তোলে, অত্যন্ত বেদনা সমৃদ্ধ করে তোলে, এই বেদনা সহ্য করতে না পেরে মানুষ মৃত্যুবরণ করে। তখন এই রোগের তাড়নায় বহুলোক মারা গেল। এভাবে বৈশালীনগরে মহামারী অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ ভয়, অমনুষ্য বা অপদেবতার ভয়, রোগভয় দেখা দিল। পুরো বৈশালীনগর জুড়ে এই তিন প্রকারের ভয় উৎপন্ন হল। তখন নগরবাসীরা এই ভয়গুলোর থেকে বা এসবের হাত থেকে বাঁচার কোনো উপায় না পেয়ে, সমস্ত নগরবাসী একত্রিত হয়ে রাজার কাছে গেলেন। তারা রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ নিবেদন করলেন–

মহারাজ নগরে তিন প্রকার ভয় উৎপন্ন হয়েছে। আগে সাত রাজা রাজত্ব করাকালীন সময়ে এইরকম ভয় দেখা যায়নি। রাজা অধার্মিক হলে, প্রজা কষ্ট পাই। অধার্মিক রাজা শাসন বা রাজত্বকালীন সময়েই এরকম ভয় দেখা দেয় বা উৎপন্ন হয়ে থাকে। নগরবাসীর এরূপ মন্তব্য শুনে রাজা একটি সভার আয়োজন করে সেখানে রাজপরিষদসহ-নগরবাসীদেরও একত্রিত করিয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে রাজা বললেন- যদি আমার কোনো অন্যায়, অবিচার বা অধর্মতা থাকে তাহলে আপনারাই আমার বিচার করুন। তখন বৈশালীনগরবাসী যেদিন রাজাকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে রাজা করেছেন সেদিন হতে বর্তমান পর্যন্ত রাজার আচার - আচরণ সমস্ত কিছু পরীক্ষা বা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেও রাজার কোনো দোষ - ত্রুটি, ভুলত্রুটি দেখতে পেলেন না।। তখন তারা সকলেই বললেন- মহারাজ আপনার কোনো দোষ

নেই। অতঃপর রাজাসহ সকল নগরবাসীগণ আলোচনায় বসলেন- তারা উপায় খুঁজতে লাগলেন এই ত্রি-ভয় থেকে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায়। তখন কেউ কেউ বললেন - বলিকর্ম বা পশুহত্যা করে সেই রক্ত দিয়ে পূজা-যজ্ঞ করলে মুক্ত হব, আবার কেউ বললেন- দেবগণের নিকট প্রার্থনা করলে মুক্ত হওয়া যাবে, আবার অন্যজন বললেন- কোনো মঙ্গলজনক অনুষ্ঠান করলে এই ভয় থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। এভাবে যে যেভাবে বুদ্ধি বের করল সমস্ত বুদ্ধি অনুসারে কাজ করা হলেও কিন্তু দুঃখের বিষয় ত্রি-ভয় তো দূর হলো না, বরঞ্চ অর্থ ক্ষয়, সম্পত্তির ক্ষয় হলো। তখন আবার কয়েকজন নগরবাসী বললেন- আমরা শুনেছি জগতে নাকি ছয়জন মহাপ্রভাবশালী শাস্তা বা শিক্ষক আছেন, তারা এই নগরে পদার্পণ করা মাত্রই রোগভয় দূরীভূত হবে। এখানে ছয়জন শাস্তা বা শিক্ষক বলতে ছয়জন নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসীদেরকেই বোঝানো হচ্ছে। (এই ছয়জন হলেন পূরণকশ্যপ মক্ষলি গোসাল, অজিত কেশকম্বলী পকুধ কচ্চায়ন নিগণ্ঠ নাতপুত্ত, সঞ্জয় বেলট্ঠি পুত্ত- শ্রামণ্যফল সূত্র) এই কথায় সবাই একমত হতে না পেরে আবার অন্য একদল নগরবাসী বললেন- জগতে সম্যক সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন। সেই ভগবান অর্হৎ ইত্যাদি বুদ্ধের নয়গুণের কথা বলে তারা বললেন-সম্যক সম্বুদ্ধগণ সত্ত্বগণের কল্যাণের জন্য, মঙ্গলের জন্য উৎপন্ন হন। তারা সকল প্রাণীর সুখের জন্য ধর্মদান করে থাকেন। সেই ভগবান মহা ঋদ্ধিসম্পন্ন এ মহাগুণের অধিকারী। অতএব ভগবান বুদ্ধ এই নগরে পদার্পণ করা মাত্রই এই ত্রি-ভয় দূর হবে। যে নগরবাসীরা বুদ্ধের কথা বললেন বা যে নগরাসীগণ বুদ্ধকে নিয়ে আসার কথা বললেন তাদের এই প্রস্তাবকে পুরো বৈশালীনগরবাসী একবাক্যে স্বীকার করে নিলেন যে, হ্যাঁ ঠিক ঠিক পারলে একমাত্রই বুদ্ধই পারবেন এই ত্রি-ভয় থেকে আমাদের উদ্ধার করতে। যারা এই প্রস্তাবটি রেখেছিল তাদেরকে সকল বৈশালীনগরবাসীগণ অভিনন্দন জানাল এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল। এখন বুদ্ধকে বৈশালীনগরে নিয়ে আসার কথা তো ঠিক হল কিন্তু ভগবান বুদ্ধ এখন কোথায় অবস্থান করছেন? সেই সভায় উপস্থিত সকলেই একে অপরকে এই প্রশ্নটি করতে লাগলেন। কিন্তু কেউই সঠিক করে বলতে পারলেন না যে ভগবান এখন কোথায় অবস্থান করছেন। তখন সেই সভার মাঝখান থেকে একজন বলে উঠলেন- ভগবান বুদ্ধ এখন কোথায় আছেন তা আমি জানি। তিনি হলেন মহালি লিচ্ছবি-কুমার। উল্লেখ্য বিষয় যে, রাজা বিম্বিসার প্রথম যেদিন যষ্টিবনে বা লাঠিরবনে বুদ্ধকে দেখতে গিয়েছিলেন, সেদিন বিম্বিসার রাজার সাথে মহালি কুমারও ছিলেন এবং সেদিন বুদ্ধের ধর্মদেশনা শ্রবণের পর বিম্বিসার রাজা ও অন্যান্যরাসহ মহালি কুমার ও শ্রোতাপত্তি ফল লাভ করেছিলেন। সেসময় বর্ষাবাস করার সময় প্রায় চলে এসেছিল বলে রাজা বিম্বিসার বুদ্ধকে প্রার্থনা করেছিলেন সেই বর্ষাটি রাজগৃহে অবস্থান করার জন্য। তাই তখন ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন বলে মহালি কুমার জানতেন।

মহালি কুমারের কাছ থেকে এই খবরটি জানার পর তখন পুরো বৈশালীনগরবাসী সেখান থেকে রাজগৃহে যাওয়ার জন্য যা যা জিনিসের প্রয়োজন হয় সবকিছু জোগাড় বা বন্দবস্ত করে দিয়ে মহালি কুমার ও লিচ্ছবি পুরোহিত পুত্রকে পাঠিয়ে দিলেন রাজগৃহের বিম্বিসার রাজার কাছে। আর বৈশালীনগরবাসী তাদের দু'জনকে বললেন- যাও বাচারা যে কোনো প্রকারেই ভগবান বুদ্ধকে বৈশালীনগরে নিয়ে এসো। তারা ও তাই হোক বলে রাজ গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। মহালি কুমার ও লিচ্ছবি পুরোহিত পুত্র দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে পৌঁছে গেলেন রাজগৃহ নগরে বিম্বিসার রাজার কাছে। তারা রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে আসার সময় সঙ্গে করে রাজার জন্য কিছু উপহার নিয়ে এসেছিলেন, তারা সেই উপহারগুলো বিম্বিসার রাজাকে দিলেন। রাজাকে উপহারগুলো দেওয়ার পর মহালি লিচ্ছবি কুমার ও পুরোহিত পুত্র রাজাকে বিনীতভাবে নিবেদন করলেন- মহারাজ! ভগবান বুদ্ধকে আমাদের নগরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা আপনার কাছে অনুমতি চাচ্ছি? বিম্বিসার রাজা লিচ্ছবি কুমার ও পুরোহিত পুত্রের এই কথা শুনে তাদেরকে বললেন- আপনারাই গিয়ে ভগবান বুদ্ধকে প্রার্থনা করুনঃ যদি ভগবান যেতে চান তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আর ভগবান যেতে না চায়লেও তাতে আমার কিছু করার নেই, তার জন্য আমি এখন সরাসরি অনুমতি দিতে পারছি না, রাজা এই কথা বলে তাদের দু'জনকে ভগবান বুদ্ধের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর মহালিকুমার ও লিচ্ছবি পুরোহিত পুত্র যেখানে ভগবান বুদ্ধ অবস্থান করছেন তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবান বুদ্ধকে বন্দনা করে, হাতজোড় করে এই প্রার্থনাটি করলেন ভান্তে, ভগবান- বৈশালীনগরে তিনপ্রকার ভয় দেখা দিয়েছে। ভান্তে, আপনি যদি আমাদের নগরে পদার্পণ করেন তাহলে ত্রি-ভয় ও সমস্ত অন্তরায় দূর হবে। ভান্তে, আমাদের পার্থনা গ্রহণ করুন। ভগবান বুদ্ধ তাদের কথা শুনে দিব্যজ্ঞান প্রসারিত করে চিন্তা করলেন- যদি আমি বৈশালীতে পদার্পণ করি তখন দেবরাজ ইন্দ্র দেবপরিষদবর্গ নিয়ে আমাকে দেখার জন্য বা বন্দনা করার জন্য আসবে, পুণ্যবান দেবগণ সেখানে আগমন করলে মঙ্গল হবে। বৈশালী নগরে "রতন সূত্র" পাঠ করলে সেই সূত্রের গুণের প্রভাব শত সহস্র কোটি চক্রবালকে মুগ্ধ করবে। সূত্রপাঠ শেষ হওয়ার সাথে সাথে চুরাশি হাজার প্রাণীর ধর্ম জ্ঞান লাভ হবে। আর বৈশালীনগরে যেসমস্ত ভয় উৎপন্ন হয়েছে, সেইসব ভয় ও দূরীভূত হবে। ভগবান বুদ্ধ এসব চিন্তা করার পর মহালি লিচ্ছবি কুমার ও লিচচ্ছবি পুরোহিত পুত্রের প্রার্থনা স্বীকার করলেন।

অতঃপর বিম্বিসার রাজা শুনতে পেলেন যে, ত্রিলোকের শাস্তা (শিক্ষক) ভগবান বুদ্ধ নাকি বৈশালীনগরে যাওয়ার জন্য সম্মতি প্রদান করেছেন। রাজা এই কথা শোনার পর ঘোষককে দিয়ে পুরো রাজগৃহ নগরে ঘোষণা করে দিলেন যে, ভগবান বুদ্ধ বৈশালীনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। তারপর বিম্বিসার রাজা ভগবান বুদ্ধের কাছে গিয়ে বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন- ভান্তে

ভগবান, শুনেছি আপনি নাকি বৈশালীনগরে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিয়েছেন বা সম্মতি প্রদান করেছেন?

রাজার এই কথা শুনে বুদ্ধ বললেন– হ্যাঁ মহারাজ। আমি তাদের প্রার্থনা স্বীকার করেছি। বুদ্ধের এই বাক্য শ্রবণ করে রাজা বললেন-ভান্তে, তাহলে আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি আপনার যাত্রার সু-ব্যবস্থা করছি। তাই হোক বলে বুদ্ধ সম্মতি দিলেন। তারপর বিম্বিসার রাজা রাজগৃহ নগর থেকে গঙ্গানদী পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা পরিষ্কার করালেন। উঁচু - নিচু জায়গাগুলো সমান করে দিলেন। রাস্তার দুইপাশে সমস্ত রাস্তায় পতাকা সাজিয়ে দিলেন। রাজগৃহ নগর থেকে গঙ্গানদী পর্যন্ত রাস্তায় দুইপাশে মঙ্গলঘট ও কলাগাছ বসিয়ে দিলেন। তারপর বিম্বিসার রাজা ভগবান বুদ্ধের কাছে (নিকট) উপস্থিত হয়ে বললেন– ভান্তে আপনার গমনা - গমনের জন্য সবকিছুর সুব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনার যাত্রা করার এখনই উপযুক্ত সময়। রাজার এই প্রার্থনার নিবেদনে, ভগবান বুদ্ধ পাঁচশত ভিক্ষু সঙ্গে নিয়ে বৈশালীর উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করলেন। ভগবান বুদ্ধকে ছায়া প্রদানের জন্য রাজা বিম্বিসার বড় একটি সাদা ছাতা ধারণ করলেন বুদ্ধের মাথার উপরে। অন্য আরেকজন ছোট একটি সাদা ছাতি ধারণ করলেন বুদ্ধের মাথার উপরে বড় ছাতাটার নিচে। এভাবে বুদ্ধের জন্য দুটি ছাতা মাথার উপরে ধারণ করে বাকী পাঁচশত ভিক্ষুর জন্যও ছাতা ব্যবস্থা করে দিলেন রাজা। রাজগৃহ নগরের পাঁচশত নগরবাসী প্রত্যেক ভিক্ষুর জন্য একটি একটি করে ছাতা ধরলেন মাথার উপরে। মহাসমারোহে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘদেরকে পুষ্প দিয়ে পূজা করতে করতে এগিয়ে দিতে লাগলেন বিম্বিসার রাজা স্ব-পরিবারবর্গ মিলে। অতঃপর রাজগৃহের সকল নগরবাসীগণ জানতে পারলেন যে, ভগবান বুদ্ধ নাকি বৈশালীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছেন। তারপর তারাও নানা ধরনের সুগন্ধি দ্রব্যসহ ও পুষ্প বা ফুল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে ফুল দিয়ে পূজা দিতে লাগলেন।

বিম্বিসার রাজা স্ব-পরিবারবর্গ-রাজগৃহের নগরবাসী সকলে মিলে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে এভাবে পূজা দিতে দিতে যেতে লাগলেন এবং রাজা বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘ বিশ্রামের জন্য যে বিশ্রাম ঘর তৈরি করে দিয়েছিলন সেখানে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে বিশ্রাম করিয়ে পূজা ও মহাদান দিতে দিতে পাঁচ দিনেই গাঙ্গানদীর তীরে উপস্থিত হলেন বা পৌঁছেগেলেন। গঙ্গানদীর তীরে উপস্থিত হওয়ার পর বিম্বিসার রাজা নদীতে থাকা নৌকাগুলো ভাড়া করলেন। তারপর তিনি বৈশালীনগরবাসীকে খবর দেয়ার জন্য একজন দূত পাঠালেন বৈশালীনগরে। অতঃপর বিম্বিসার রাজা ভাড়া করা নৌকাগুলো থেকে দু'টি বড় নৌকা জড়ো করে শক্ত করে বাঁধলেন। তারপর ফুল, রঙিন কাপড়সহ আরও বিবিধ সাজ-সজ্জার উপকরণ দিয়ে নৌকা দু'টো সুন্দর করে সাজালেন। সাজানো নৌকার উপরে বুদ্ধের জন্য নন্দনীয় একটি আসন প্রস্তত করলেন। অতঃপর বৈশালীনগরবাসীগণ শুনতে পেলেন যে, ভগবান বুদ্ধ নাকি গঙ্গানদীর তীরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তারপর তারা বললেন- বিম্বিসার

রাজা ভগবান বুদ্ধকে যে পরিমাণ দানীয় বস্তু দ্বারা পূজা করেছেন আমরা তার দুইগুণ দানীয় বস্তু দ্বারা বুদ্ধকে পূজা করব। এরপর বৈশালীনগরবাসী ভগবান বুদ্ধের জন্য চারটি ছাতা প্রস্তুত করলেন। তারপর প্রত্যেক ভিক্ষুর জন্য বা পাঁচশত ভিক্ষুর জন্য দু'টি করে এক হাজার ছাতা বা ছাতি প্রস্তুত করালেন। তারপর তারা বৈশালীনগর থেকে গঙ্গানদীর তীর পর্যন্ত, উঁচু-নিচু জায়গা সমান করতে করতে এবং পুরো রাস্তা সাজাতে সাজাতে অবশেষে উপস্থিত হলেন গঙ্গানদীর তীরে। তারপর তারা নৌকা যোগে, পার হলেন গঙ্গানদী। নদী পাড় হয়ে ভগবান বুদ্ধ যেখানে আছেন সেখানে উপস্থিত হলেন। এদিকে বিম্বিসার রাজা ভগবান বুদ্ধকে নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে দিলেন। ভিক্ষুসংঘরাও ভগবান বুদ্ধকে চারদিক পরিবেষ্টন করে নৌকায় বসে পড়লেন। তারপর বিম্বিসার রাজা বুদ্ধকে অনুসরণ করতে করতে গলাঃ সমান জলে নেমে গেলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বুদ্ধকে বললেন– ভান্তে, ভগবান- যতদিন আপনি ফিরে আসবেন না, ততদিন আমি এই গঙ্গানদীর তীরেই আপনার জন্য অপেক্ষা করব। এই কথাটি বলে বিম্বিসার রাজা জল থেকে তীরে উঠে এলেন এবং যতদূর পর্যন্ত ভগবান বুদ্ধের নৌকাটি দেখা যাচ্ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তাকিয়ে-থাকলেন। ভগবান বুদ্ধ নৌকাযোগে গঙ্গানদী পাড়ি দিয়ে অবশেষে পৌঁছে গেলেন বৈশালীনগরের সীমানায় গঙ্গানদীর তীরে। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন লিচ্ছবি রাজা ও বৈশালীনগরবাসী। লিচ্ছবি রাজা ও গলাঃ সমান জলে নেমে বুদ্ধের নৌকাকে তীরে বা কূলে টেনে নিলেন। তারপর বুদ্ধকে নৌকা থেকে নামিয়ে নিলেন। ভগবান বুদ্ধ নৌকা থেকে নেমে পদমূল (পা) মাটিতে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে মহামেঘ রাশি উঠে গিয়ে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগল। তখন পুরো বৈশালীনগরের নিম্নাঞ্চলগুলো জলে প্লাবিত হল। অধিক বৃষ্টির কারণে পানি এত পরিমাণ হয়েছিল যে, সেই বৃষ্টির পানি দ্বারা মৃতদেহগুলো ভেসে গিয়ে গঙ্গানদীতে গিয়ে পড়ল। তখন গঙ্গানদীর পানি বা জল সকল মৃতদেহগুলো তলিয়ে (ভাসিয়ে) নিয়ে গেল। পুরো বৈশালীনগর দূষণমুক্ত হল, আর কোথাও বা কোনো জায়গায় মৃতদেহ পড়ে রইল না। এর ফলে বায়ু দুর্গন্ধমুক্ত হল। বৈশালীনগরের মাটি পরিশুদ্ধতা ধারণ করল। অতপর লিচ্ছবিরাজা ও বৈশালীনগরবাসীরা সকলে সম্মিলিতভাবে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘরা বিশ্রামের জন্য (জিড়িয়ে নেওয়া) যেখানে যেখানে-কুটির বা বিশ্রামাগার তৈরি করে দিয়েছিলেন সেখানে সেখানে বুদ্ধকে বিশ্রামের জন্য বসিয়ে দুইগুণ পরিমাণ মহাদান দিয়ে, দুইগুণ পরিমাণ পূজা দিয়ে বা (দুইগুণ মহাদান ও দুইগুণ পূজা দিতে দিতে) তিনদিনের মধ্যে বৈশালীনগরে আনয়ন করালেন বা পদার্পণ করালেন।

ভগবান বুদ্ধ বৈশালীতে আগমন করলে তখন দেবরাজ ইন্দ্র (সক্ক) দেবপরিষদসহ ও অপ্সরা পরিবৃত হয়ে যেখানে ভগবান অবস্থান করছেন সেখানে উপস্থিত হলেন। মহা-শক্তিশালী বা ঋদ্ধিবান দেবগণের মহাসমাবেশ

(উপস্থিতি) দেখে অমনুষ্যগণ (অপদেবতা) ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। শাস্তা ভগবান বুদ্ধ সন্ধ্যাবেলায় বৈশালীনগরের প্রবেশ মুখে প্রধান গেইটে বা দরজায় দাঁড়িয়ে আনন্দ ভান্তকে বললেন– আনন্দ, তুমি এই 'রতনসূত্র' শিখে নিয়ে মুখস্ত কর এবং লিচ্ছবি রাজকুমারদের সঙ্গে নিয়ে বৈশালীর তিন দেয়ালের ভেতরে (প্রাকার, প্রাচীর) ঘুরে ঘুরে এই 'রতন সূত্রটি পাঠ কর।

অতঃপর বুদ্ধের আদেশে আনন্দ ভান্তে বুদ্ধের কাছ থেকে 'রতন সূত্র'টি শিখে নিয়ে ভগবান বুদ্ধের (দেবরাজাদের দান করা পাত্র) সেই শিলা পাথরের ভিক্ষা পাত্রে জল (পানি) নিয়ে নগরের মূল দরজায় বা গেইট থেকে সূত্রপাঠ শুরু করলেন। আনন্দ ভান্তে সূত্রপাঠটি যেভাবে আরম্ভ করেছিলেন তা হচ্ছে এইরকম যেমন– রতন সূত্রের নিধান হতে শুরু করে বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যে দশ পারমিতা, দশ উপপারমিতা, দশ পরমার্থ পারমিতা বেঁধে এই ত্রিশ প্রকার পারমিতা, তথাগত বুদ্ধের পঞ্চ মহাপরিত্যাগ, লোকার্থ চরিথা- সকল জীবনের কল্যাণের জন্য বা মুক্তির জন্য, জ্ঞাতী চরিথা– জ্ঞাতী ও আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের কল্যাণের জন্য, বুদ্ধত্ব চরিথা- বুদ্বত্বলাভের জন্য বা দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের জন্য, এই তিন প্রকার চর্যার মাধ্যমেই তথাগত বুদ্ধ ত্রিশ প্রকার পারমি পূরণ করে অন্তিম বা শেষ জন্মে মাতৃগর্ভে প্রবেশ, জন্ম, গৃহত্যাগ, প্রধান চর্যা বা আচরণ কঠোর তপস্যার মাধ্যমে বোধিপালঙ্কে বা বজ্রাসনে মারকে পরাজয় করে, সর্বজ্ঞতা জ্ঞানলাভ বা বুদ্ধত্বলাভ, ধর্মচক্র প্রবর্তন, নবলোকোত্তর ধর্মসহ সকল বুদ্ধগণের গুণ স্মরণ করতে করতে নগরের ভেতরে প্রবেশ করলেন। আনন্দ ভান্তে সূত্রপাঠ করতে করতে পুরো নগর প্রদক্ষিণ করলেন। আনন্দ ভান্তে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত এই ত্রি-যাম পুরো বৈশালীনগর ঘুরে ঘুরে 'রতনসূত্র পরিত্রাণ' পাঠ করলেন। আনন্দ ভান্তে 'যং কিঞ্চি' অর্থাৎ যা কিছু আছে এই কথাটি উচ্চারণ করা মাত্রই উপরের গরম জল অমনুষ্যগণের ওপর গিয়ে পড়ল। (সূত্রপাঠের পানি অমনুষ্যগণের জন্য গরম জল মনে হয়েছিল)। আবার 'যানীধ ভূতানি' অর্থাৎ এখানে যত জীব গাথাসহ অন্যান্য গাথা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে অতি শোভনীয় ফুলের মালার ন্যায় পরিত্রাণ পাঠ করা জলবিন্দুগুলো উড়ে গিয়ে রোগগ্রস্থ মানুষদের উপর গিয়ে পড়ল।

পাদটীকা:

প্রাচীন লিচ্ছবিগণ প্রথমে ছোট্ট একটি নগর গড়ে তোলে সেখানে নগরের চারদিকে উঁচু দেয়াল দিয়েছিল। পরে নগরের মধ্যে জনসংখ্যা বেড়ে গেলে আর ও দুইবার নগরের সীমা বাড়িয়ে নেয়। এভাবে বৈশালীনগরে তিনটি উঁচু দেয়াল হয়ে যায়। এই তিনটি দেয়ালের কথায় বলা হচ্ছে এখানে। দেয়াল বলতে- নগরের বাউন্ডারিকে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা দেওয়াকে বোঝানো হচ্ছে।

তৎক্ষণাৎ (সঙ্গে সঙ্গে) রোগগ্রস্থ মানুষেরা রোগমুক্ত হয়ে আনন্দ ভান্তেকে ঘিরে দাঁড়াল। অতঃপর যং কিঞ্চি অর্থাৎ যা কিছু আছে, এই কথাটি বলার পরও যে সমস্ত অমনুষ্যগণ পালিয়ে যায়নি, যারা ময়লা আবর্জনায়, গৃহকূট (ঘরের ছাদে লুকিয়েছিল) গৃহভিত্তি বা ঘরের সীমানা ভিটা মাটিতে, প্রবেশ পথে আত্মগোপনে লুকিয়েছিল, তারা যে যেদিকে পারে সেদিকে পালিয়ে গেল। নগরে এত বেশি অমনুষ্য প্রবেশ করেছিল যে, নগরের দরজা দিয়ে পালানোর পথ পর্যন্ত সীমিত হয়েছিল অমনুষ্যদের জন্য, কিছু কিছু অমনুষ্য পথ না পেয়ে বৈশালীনগরের উঁচু দেয়াল ভেদ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ পালানোর দরজাগুলোতে অমনুষ্যগণ পালানোর জন্য লাইন ধরেছিল। তাই তারা দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে দেয়াল ভেদ করে পালিয়ে গেল। অমনুষ্যগণ পালানোর পর নগরের মনুষেরা স্বস্থিবোধ লাভ করল।

অতঃপর বৈশালীনগরের সকল নগরবাসীগণ নগরের মাঝখানে যে গণভবন ছিল সেই গণভবনে সবাই উপস্থিত হয়ে সম্মিলিতভাবে সেই গণভবনটিকে সকল প্রকার সুগন্ধিযুক্ত দ্রব্য দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করলেন। তারপর তারা নানা রঙিন সাজ-সজ্জা দিয়ে ভবনটিকে বিচিত্র আকারে সাজালেন। তারপর সেখানে রাজা বা মন্ত্রীর আসনের জায়গায় বুদ্ধের আসন বসালেন। এরপর মহাসমারোহে ভগবান বুদ্ধকে সেই ভবনে নিয়ে গেলেন, ভগবান বুদ্ধ নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়লেন। মহাভিক্ষু সংঘ ও লিচ্ছবিগণও বুদ্ধকে মাঝখানে রেখে যার যার নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়লেন। অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্রও দেবপরিষদবর্গ নিয়ে শূণ্যে নির্দিষ্ট আসনতুল্য স্থানে ভাসমানভাবেই অবস্থান করলেন তারপর পুরো বৈশালীনগর প্রদক্ষিণ ও পরিত্রাণ সূত্রপাঠ শেষ করে আনন্দ ভান্তেও লিচ্ছবি রাজকুমারদেরকে সঙ্গে করে এনে বাকী রোগমুক্ত মানুষেরা ও আনন্দ ভান্তকে অনুসরণ করতে করতে সেখানে উপস্থিত হলেন, আনন্দ ভান্তে ভবনে প্রবেশ করে বুদ্ধকে বন্দনা করে নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়লেন বাকীরা ও যার যার আসন গ্রহণ করলেন। ভগবান বুদ্ধ সেই বিশাল জনতার পরিষদের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রতনসূত্র দেশনা করলেন। দেশনা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চুরাশি হাজার প্রাণী ধর্মজ্ঞান লাভ করল। এভাবে ভগবান বুদ্ধ একসপ্তাহ ধরে বৈশালীতে রতনসূত্র দেশনা করলেন। একসপ্তাহ পর আর কোনো প্রকার ভয়ের আশঙ্কা দেখতে না পেয়ে ভগবান বুদ্ধ বৈশালী লিচ্ছবিগণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। লিচ্ছবি রাজা ও বৈশালীনগরবাসী দুইগুণ পূজা ও দান দিতে দিতে তিনদিনের মধ্যে গঙ্গানদীর তীরে বুদ্ধকে নিয়ে আসলেন।

ভগবান বুদ্ধ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হলে গঙ্গানদীতে থাকা নাগরাজগণ চিন্তা করলেন, মানুষেরা তথাগত বুদ্ধকে সৎকার, পূজা, বন্দনা করছে, তাহলে আমরা কেন করব না? অতঃপর তারা সুবর্ণময় (সোনার দ্বারা তৈরি বা সোনালী রঙের তৈরি নৌকা), রজতময় (রুপার দ্বারা তৈরি বা রূপালী রঙের নৌকা), মনিময়

(রত্নখচিত বা রত্নদ্বারা সজ্জিত বা সাজানো নৌকা) এই তিন ধরনের মূল্যবান নৌকা সাজিয়ে এবং সুবর্ণ, রজত, মণিময় তিন ধরনের আসন প্রস্তুত করে পাঁচ রঙের পদ্মফুল নদীতে এমনভাবে সাজালেন যে গঙ্গানদীর পানি ঢেকে গিয়েছিল। এরপর নাগগণ বুদ্ধকে বললেন- ভান্তে ভগবান অনুগ্রহপূর্বক আমাদের নৌকায় উঠুন। ভগবান বুদ্ধ তাদের প্রার্থনা বা অনুরোধ রক্ষার্থে তাদের নৌকায় উঠে সাজানো আসনে বসে পড়লেন। নাগগণও বহু পূজোর সামগ্রী দ্বারা বুদ্ধকে পূজা, সৎকার ও বন্দনা করলেন। অতঃপর ভূমিবাসী দেবগণ, চিন্তা করলেন- মানুষ এবং নাগেরা বুদ্ধকে পূজা দিচ্ছে তাহলে আমরা কেন দেব না, এভাবে ভূমিবাসী দেবগণ থেকে শুরু করে দেবলোক, ব্রহ্মালোক, অকনিষ্ঠ ব্রহ্মালোক পর্যন্ত সকল দেব ব্রহ্মরা বুদ্ধকে সেবা, পূজা ও সৎকার করলেন। এভাবে ভগবান বুদ্ধ বৈশালীনগরের যাবার সময়ও বহু শতগুণ সেবা পূজা পেয়েছিলেন। ভগবান এভাবেই লিচ্ছবিনগরের দুঃখ-দুর্দশা দূর করালেন। (সংক্ষিপ্ত) পুরো কাহিনী জানতে হলে পড়ুন ধর্মপদ অর্থকথা প্রকীর্ণক-বর্গ) বুদ্ধের- স্বর্গীয় পূর্বকর্মের উপাখ্যানটি।

জগতে (বিশ্ব) সর্বপ্রথম গণতন্ত্রের উৎপত্তি

মূল আলোচনায় যাবার পূর্বে আমরা এখন আলোচনা করব- এই গণতন্ত্র আসলে কী? গণতন্ত্র বলতে কি বুঝায়? দেশে, গ্রামে, নগরে, সমাজে এবং প্রতিটা পরিবারে এই গণতন্ত্র ব্যবস্থা থাকা উচিত বা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

কোনো দেশে, গ্রামে, নগরে, কিংবা পরিবারের কোনো কর্ম করলে, সমস্যা হলে পুণ্যকর্ম করতে, মিটিং বা সভা আহ্বান করলে সবাই একত্রে উপস্থিত হয়ে সবাই একত্রে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, 'সকল কার্যক্রম সবাই সম্মিলিতভাবে পরিচালনা করার নাম গণতন্ত্র।

গণতন্ত্র বলতে বুঝায়- যেই দেশে, গ্রামে, নগরে, কিংবা পরিবারে-একে অপরের প্রতি মনোমালিন্য না রেখে সকলেই সমানভাবে সকল সুযোগ- সুবিধা ভোগ করতে পারা আমি বড় তুমি ছোট, আমি জ্ঞানী তুমি অজ্ঞানী, আমি ধনী তুমি গরীব এরূপ বিভাজন না করে সবাইকে সমান অধিকারের চোখে দেখতে পারার নামই গণতন্ত্র। প্রতিটা দেশে, গ্রামে, নগরে কিংবা পরিবারে গণতন্ত্রের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। প্রিয় পাঠকবৃন্দ মনে করতে পারেন যে আমি এখানে রাজনীতির কথা বলছি, না! আমি মোটেই রাজনীতির কথা বলছি না। সবাই যেন সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে, অবস্থান করতে পারে সেই কথা বলছি। বাস্তবিক অর্থে গণতন্ত্রকে বুঝানো হয়- সুখে, শান্তিতে বসবাস করার জন্য কিছু নীতি বা আইন মান্য করা, আচরণ করা। যে নীতি মান্য না করলে আচরণ না করলে উন্নতি হওয়া দূরহ ব্যাপার আর অবনতি বা পতন তো প্রতিনিয়ত হবেই। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রতিটা মানুষ, প্রতিটা জীব, একা একা চলতে পারে না। আর বাঁচতে পারে না। প্রত্যেক প্রাণীর বাঁচার জন্য কিংবা জীবনধারণের জন্য সঙ্গীর প্রয়োজন হয় সঙ্গী ছাড়া সকলে অচল। ঠিক তদ্রুপ একটি দেশ, একটি গ্রাম, একটি নগর একটি পরিবার, একটি সমাজ সমচিত্ত হতে না পারলে সেখানে উন্নতি হয় না বরঞ্চ প্রতিনিয়ত পরাজয় ঘটে। অর্থাৎ একটি নগরে সকল নাগরিক, একটি গ্রামের সকল গ্রামবাসী, একটি সমাজের সকল সামাজিক কর্মকর্তাবৃন্দ যদি একে অপরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হতে না পারে তাহলে তাদের নিশ্চিত পরাজয় বুঝতে হবে।

গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক এই শব্দটি শুনতে যতটা সহজ মনে হলেও এর গভীরতা কিন্তু সহজসাধ্য নয়। আমরা এখন গণতন্ত্র নিয়ে ধাপে ধাপে জানার চেষ্টা করবো। পশ্চিমা বিশ্বের কিছু লেখক-গবেষক দাবি করেন তাদের দেশের মতো শান্তিপূর্ণ দেশ আর কোথাও ছিল না। তারা এটাও দাবী করেন যে, তাদের দেশ থেকেই গণতন্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তাদের দেশে যে, প্রাচীনত্ব গণতন্ত্রের কথা পরিষ্কার নয়। যেমন– গ্রীসের রাজধানী শহর এথেন্স। অনেকের মতে বা অনেকেই মনে করেন এই এথেন্স শহর থেকে গণতন্ত্রের উৎপত্তি ঘটেছে। কিন্তু আমি-প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস পড়ে আমার মনের মতো নৈতিকতা দেখতে পায়নি। তারা নৈতিকতার আইন তৈরি করত বটে কিন্তু সে আইনগুলো আবার তারা নিজেরাই ভঙ্গ করত। তাহলে এই নীতিকে গণতন্ত্র বলব কিভাবে? এখানে সব বিষয় তুলে ধরা সম্ভব নয়। পাঠকবৃন্দের গ্রীসের ইতিহাস জানার আগ্রহ থাকলে পড়ে নেবেন। আপনাদের সুবিধার্থের জন্য আমি এখানে দু'টি বই সাজেস্ট করলাম: এক. ***প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস- (পঞ্চম শতাব্দী)***, দুই. ***গ্রীস ও রোমের ইতিহাস।*** এ দুটি বই ছাড়াও আরো অনেক বই আছে। এগুলোই হচ্ছে তথ্যবহুল বই। তারপর ও আপনাদের একান্ত ইচ্ছা থাকলে বাকী ঐতিহাসিক বইগুলোও পড়ে নিবেন।

পশ্চিমা বিশ্বের লেখক ও গবেষক কিংবা প্রচারকরা যদি ভুল ইতিহাস প্রচার করে থাকেন বা তাদের দেশে যদি গণতন্ত্রের উৎপত্তি না ঘটে তাদের 'কথা যদি বিশ্বাসযোগ্য না হয় তাহলে কোন দেশেই বা গণতন্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে বা কাকে আমরা বিশ্বাস করব? জানি এই প্রশ্নটি সবার মনে ঘুরপাক খাবে। আসুন এই প্রশ্নের সমাধান করি।

আমরা ইতিহাসের কিছু বিষয় জানার পর রীতিমত অবাক না হয়ে থাকতে পারি না তখন আমরা মনে মনে চিন্তা করি এটা কিভাবে সম্ভব? পৃথিবীতে আধো এইরকম কিছু হতে পারে নাকি? হ্যাঁ হতে পারে। শুধু ধৈর্য আর নৈতিকতা থাকলেই সম্ভব হয়। আমরা এটাও জানি যে ভালো বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ইতিহাসের পাতায় খুব কম স্থান দখল করে নিতে পারে। আমরা এখন সেই আলোচনাটি করব।

এক. প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস, দুই. গ্রীস ও রোমের ইতিহাস। এই দু'টি বই প্রচুর তথ্যবহুল তাই আমি এই দু'টি বই সাজেস্ট করেছি।

এই আলোচনাটিও ইতিহাসের পাতায় খুব কম স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে কিছু নির্বোধ ব্যক্তি এসব গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস লুকিয়ে রাখতে চায়। সত্যের ইতিহাস লুকিয়ে থাকে না বা এটাকে লুকিয়ে রাখা যায় না। আমরা জানি বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় মাটি খনন করার সময় বৌদ্ধ বিহার, বুদ্ধ প্রতিবিম্ব (বুদ্ধমূর্তি) পাওয়া যাচ্ছে। এসব বিহারগুলো ছিল একসময় নান্দনিক বিহার। কিন্তু কালের করালগ্রাসে আক্রান্ত হয়ে সেই নান্দনিক বিহারগুলো বর্তমানে ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়ে পরে আছে। খননকার্যের মাধ্যমে গুটিকয়েক বৌদ্ধ বিহার, বুদ্ধপ্রতিবিম্ব উদ্ধার হলেও আরো কত হাজার ঐতিহ্য সম্পদ যে মাটির গভীরে পরে থেকে ধ্বংস হচ্ছে আমরা কেউ জানি না। যাইহোক, বৌদ্ধদের ইতিহাস নিয়ে হাজার হাজার গ্রন্থ লেখা হলেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস নিয়ে খুব কমই লেখা হয়েছে। অথচ যাদের কথা ইতিহাসের পাতায় পাতায় নিহিত থাকার কথা কিন্তু তাদের কথা আজ ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যেতে বসেছে। ইতিহাসের মধ্যে ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ একনাম– হচ্ছে বৈশালী। এই বৈশালীকে আবার স্বর্গও বলা হয়। বৈশালী অধিবাসীগণ রূপে-গুণে নানা বিদ্যাকলায় তাবতিংস দেবগণের সমান ছিলেন।

তাদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে বয়োজ্যেষ্ঠদের দেয়া বা ধর্মীয় গুরুদের দেয়া নৈতিক উপদেশগুলো তারা অঙ্গে অঙ্গে (অক্ষরে অক্ষরে) পালন করার চেষ্টা করতেন। যেমন– ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করার পর নানা, গ্রাম, নগর ঘুরে ঘুরে ধর্মপ্রচার করার সময় একসময় বৈশালীনগর সারন্দদ চৈত্যে এসে উপস্থিত হলেন। তখন বৈশালীনগরের লিচ্ছবিগণ শুনতে পেলেন যে, ভগবান বুদ্ধ নাকি আমাদের রাজ্যে সারন্দদ চৈত্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তখন তারা নানা পূজাসামগ্রী নিয়ে ভগবান বুদ্ধের কাছে সম্মিলিতভাবে উপস্থিত হলেন। ভগবান বুদ্ধ যাকে তাকে যেমন তেমন উপদেশ কিংবা ধর্মদেশনা প্রদান করেন না। ভগবান বুদ্ধ উপদেশ দেয়ার আগে দেখেন যে, আমি যাকে উপদেশ দেব সেই ব্যক্তি বা তারা আমার উপদেশ গুরুত্ব দেবে কিনা? যদি দেখেন যে বুদ্ধের উপদেশ সফল হবে তাহলে তখনই উপদেশ প্রদান করতেন। তখন ভগবান বুদ্ধ লিচ্ছবিগণের মাঝে যৌথবদ্ধতা, একতাবদ্ধতা, সঙ্গতা, একরীতি, এককনিয়ম পালনের মান্যতা করার লক্ষণ দেখে লিচ্ছবিগণের উদ্দেশ্যে সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মদেশনা প্রদান করেছিলেন।

গণতন্ত্রের সাতটি গোপন কথা

এক. যতদিন লিচ্ছবি ও বজ্জিগণ সর্বদা সম্মিলিত হবে, সর্বদা সম্মিলিত হতে সংকোচবোধ করবে না অর্থাৎ সকালে উপস্থিত হয়েছি, বিকেলে গেছি, একদিন আগে গেছি বা সপ্তাহখানিক আগে গেছি, তারপরও বারবার সভা-সমিতি মিটিং ডাকা হয় কেন বুঝি না এসব মনোমালিন্যের কথা না বলে মিটিং, সভায় প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বজ্জিগণ ও লিচ্ছবিগণ সর্বদা একত্রিত হলে শ্রীবৃদ্ধি হবে, অবনতি বা পরাজয় হবে না।

দুই. যতদিন লিচ্ছবি ও বজ্জিগণ একতাবদ্ধ হয়ে নিয়মিত সম্মিলিত হবে সকলে একমত হয়ে এক সঙ্গে (একসাথে) উঠাবসা করবে, তাদের কর্তব্য কাজগুলো একমত হয়ে যতদিন সম্মিলিতভাবে সম্পাদন করবে ততদিন বজ্জি ও লিচ্ছবিদের উন্নতি হবে, অবনতি হবে না।

তিন. বজ্জি ও লিচ্ছবিরা যতদিন তথাগত বুদ্ধ কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করবে না অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ যেসব বিধি-বিধান, রীতি-নীতির শিক্ষা দেননি বা আইনের বিধি-বিধান, প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদ ভঙ্গ করবে না বা লঙ্ঘন করবে না অথবা বাতিল করবে না, যেসব আইন পৌরাণিক বা পুরনো বজ্জির ধর্ম (সাম্য, ঐক্য, একতা এগুলোই বজ্জিদের রাজধর্ম ছিল) প্রতিপালন করে চলবে ততদিন বজ্জি বা লিচ্ছবিদের শ্রীবৃদ্ধি হবে পরিহানি বা পরাজয় হবে না।

চার. যতদিন বজ্জি ও লিচ্ছবিরা তাদের নগরের মধ্যে থাকা বয়োজ্যেষ্ঠ লিচ্ছবিদেরকে সম্মান, গৌরব, সৎকার ও সেবা-পূজা করবে ততদিন তাদের শ্রীবৃদ্ধি হবে, পরিহানি হবে না। বজ্জিরা যতদিন বয়োজ্যেষ্ঠদের হিতোপদেশ পালন করবে ও মেনে চলবে ততদিন বজ্জিদের উন্নতি হবে অবনতি হবে না।

পাঁচ. লিচ্ছবি বা বজ্জিরা যতদিন কুলবধু ও কুলকুমারীদেরকে জোড়পূর্বক ধরে এনে নিজেদের ঘরে বন্দি করে রাখবে না, তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘরে আটকিয়ে রাখবে না ততদিন বজ্জি বা লিচ্ছবিদের শ্রীবৃদ্ধি হবে অবনতি হবে না।

ছয়. বজ্জিরা যতদিন তাদের নগরে অথবা নগরের বাইরে বজ্জি রাজাদের যেসব পুরনো চৈত্য আছে সেই সকল চৈত্যগুলোকে শ্রদ্ধা, সম্মান, গৌরব- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে পূজা করবে ততদিন বজ্জিদের উন্নতি হবে অবনতি হবে না। অথবা অতীতে কিংবা পুরনোকাল থেকে যেভাবে পূজা-সৎকার করা হচ্ছে তা তারা বন্ধ করবে না।

সাত. লিচ্ছবি বা বজ্জিরা যতদিন নগরের মধ্যে অবস্থানরত অরহতদের চার প্রত্যয় দ্বারা সেবা করবে, 'তাদের সুবিধা - অসুবিধা বিষয়ে দেখা-শুনা

করবে এবং সেগুলো পূরণ করে দেবে এবং যেসব অরহতগণ নগরে আসেননি তাদেরকে নগরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবেন ও তাদের যথাযত সম্মানে গৌরব ও পূজা করবেন ততদিন বজ্জি বা লিচ্ছবিদের উন্নতি হবে অবনতি হবে না। অঙ্গুরনিকায় (সপ্তক নিপাত) বজ্জী বর্গ ১. সারন্দদ সূত্র।

তথাগত বুদ্ধের দেওয়া এই ৭টি নৈতিক উপদেশ লিচ্ছবিগণ খুবই নিখুঁতভাবে পালন করতেন এবং পালন করে এসেছেন। এভাবে বিশ্বের প্রথম গণতন্ত্র ব্যবস্থা চালু হয় প্রাচীন বৈশালীনগর থেকে। এই সাতটি নৈতিক উপদেশ বা রীতি-নীতিই হচ্ছে গণতন্ত্র। এটাই হচ্ছে মূল গণতন্ত্র। বাকীগুলো নামে গণতন্ত্র হলেও কাজে মিল নাই। কারণ সেখানে পক্ষ-বিপক্ষ থাকে কিন্তু লিচ্ছবিদের পক্ষ-বিপক্ষ ছিলনা।, যেমন– গৃহযুদ্ধ, নিজেরা বিধি-বিধান বা আইন তৈরি করে পরে মনোপুত না হলে তা ভেঙে ফেলা ইত্যাদি।

লিচ্ছবিগণ বুদ্ধের দেয়া এই সাতটি উপদেশ যতদিন নিখুঁতভাবে মেনে চলেছেন ও পালন করেছেন ততদিন তাদেরকে ক্ষমতাবান রাজারা পর্যন্ত পরাজিত করতে পারেনি।

এই সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মের নীতির আইন মেনে চলে আমাদের ও যার যার সমাজ, গ্রাম, মজবুত করা উচিত। কেননা একটি গ্রাম, একটি সমাজ যদি দু'টি সমাজে পরিণত হয় তখন কেন জানি এক বাজে অবস্থান তৈরি হয়। তখন দেখতে খুবই খারাপ মনে হয়।

যাইহোক বাকীটা বিজ্ঞজনেরা যা মনে করেন তা গ্রহণ করবেন। আর যদি এই উপদেশগুলো ঠুংক মনে হয় তাহলে সমালোচনা না করে এড়িয়ে যাবেন।

আম্রপালির অতীত কর্মফলের অমোঘ এক বিধানের ধারা

সেই সুদূর অতীতের কথা, আজ থেকে প্রায় বিরানব্বই কল্পের পূর্ব কথা। কাসিকনগরের অধিপতি রাজা জয়সেনের স্ত্রী হলেন রাণী সিরিমা। রাণী সিরিমা ফুস্য বুদ্ধাংকুরকে জন্ম দেওয়ার সাতদিন পর বিশ্বধর্মতা অনুসারে পরলোক গমন করেন, এরপর রাজা জয়সেন আরেকটি বিবাহ করেন। ঐ রাণীর গর্ভেই আমাদের ভাবী আম্রপালি জন্ম নিয়ে নিজেকে ধন্য করেন। ভাবী আম্রপালি নিজেকে ধন্য করার কারণ হচ্ছে যে, প্রথমত তিনি জন্ম নিয়েছেন ক্ষত্রিয়কূলে রাজবংশে, দ্বিতীয়ত হচ্ছে– আবার যেই প্রাসাদে আমাদের মধ্যে যিনি কিনা জগৎপূজ্য হবেন– সেই ফুস্য বুদ্ধাংকুর এর বোন হইয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। অতি আদর-যত্নে প্রাসাদের সবার ভালোবাসায় বড় হতে লাগলেন ভাবী আম্রপালি। ধীরে ধীরে তিনি যখন বড় হয়ে যৌবনে পদার্পণ করলেন তখন তার রূপসম্পদ এতই মনোমুগ্ধকর হয়েছিল যে, তিনি সবার নজর কেড়ে নিতে সক্ষম হন। এদিকে পূজ্যভ্রাতা (ভাই) ফুস্য বুদ্ধ বুদ্ধত্বলাভ করার পর, ধর্মচক্র প্রবর্তন শেষ করেছেন কিছুদিন গত হল। ধর্মচক্র প্রবর্তন শেষ করার পর বুদ্ধ মানুষের দুঃখ মোচনার্থে বহু ভিক্ষুসংঘ নিয়ে ধর্মপ্রচার করতে লাগলেন। সেসময় পুত্রকে দেখার জন্য রাজা জয়সেনের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তিনি দূত প্রেরণ করলেন বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করার জন্য। ফুস্য সম্যক সম্বুদ্ধ পিতার নিমন্ত্রণ বার্তা পেয়ে জ্ঞাতী সম্মেলনের জন্য কাসিকনগরে যাওয়ার অভিপ্রায়ে উদ্বুদ্ধ হলেন এবং পিতার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

টীকাঃ

রাজা শুদ্ধোধনের স্ত্রী মহামায়া (সিদ্ধার্থের মাতা) মারা যাওয়ার পর শুদ্ধোধন মহামায়ার বোন মহাপ্রজাপতিকে বিবাহ করেন। রাজা শুদ্ধোধন আর রাণী মহাপ্রজাপতির ঔরসে দুটি সন্তান জন্ম নেন। একজন হচ্ছে- নন্দ, আরেকজনের নাম নন্দা। এক্ষেত্রে তারা দু'জনই গৌতম বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভাই এবং বোন। ঠিক তদ্রূপ-রাজা জয়সেনের স্ত্রী সিরিমা মারা যাওয়ার পর জয়সেন আরেকটি বিবাহ করেন। (রানীর নামটি উল্লেখ নেই) তাদের ঔরসেই ভাবী (ভবিষ্যৎ) আম্রপালির জন্ম হয়। এক্ষেত্রে আম্রপালিও ফুস্য বুদ্ধে বৈমাত্রেয় বোন হবেন। বিশ্বধর্মতা অনুসারে বুদ্ধগণ শেষ জন্মে যে মায়ের গর্ভে জন্ম নেন সেই মায়ের গর্ভে আর কোন সন্তান জন্ম নেন না। কারণ বুদ্ধাংকুরদের, বুদ্ধগণের ইহাই বিশ্বধর্মতা, বুদ্ধের ভূমিষ্ট হওয়ার সাতদিন পর তাদের মাতাগণ পরলোক গমন করেন এটাই বিশ্বধর্মতা, বুদ্ধগণ মায়ের গর্ভে নিষ্ফলঙ্গভাবে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন একটি শ্বেত পদ্মরূপে, ভূমিষ্ট হন দাঁড়ানো অবস্থায়, রক্ত, শ্লেষ্মা এবং গর্ভমলবিহীনভাবে। (দীর্ঘনিকায়-মহাবর্গ ১ম সূত্র-মহাপদান সূত্র)

ফুস্য সম্যক সম্বুদ্ধ হাজারও ভিক্ষুসংঘ নিয়ে যথাসময়ে পিত্রালয় রাজপ্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হলেন। পিতা জয়সেন বুদ্ধের আহারের ব্যবস্থা করালেন এবং বুদ্ধের আহার সমাপ্ত হলে বুদ্ধ জ্ঞাতীদের মঙ্গলের জন্য তাদেরকে উদ্দেশ্য করে দান করা এবং তার ফলের কথা, স্বর্গকথা, সংসার অসার এবং দুঃখময়, এই দুঃখ শেষ কোথায় ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাখ্যা করলেন, জ্ঞাতীগণের উপকার সাধিত হলো কিন্তু একজনের অন্তরে বুদ্ধের নিগূঢ়তত্ত্ব দেশনাটি রেখাপাত করল, তিনি জ্ঞান লাভ না করলে ও বুদ্ধের দেশনার নিগূঢ়তত্ত্বের কথা কিছুটা উপলব্দি করলেন। দানের ফল যে ব্যক্তিগত জীবনে কতটা মহৎ, কি পরিমাণ উপকার করে থাকে দানের ফল মনুষ্য-দেবগণকে কতটা শান্তি আর আনন্দ দেয় এইসব বিষয় তার অন্তরে দাগ কাটল এবং উর্ধ্বগতি ও নির্বাণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ও আবাস বলতে হয় এসব কিছু তার অন্তরে অনুভূত হল- তিনি হলেন ফুস্য বুদ্ধের বৈমাত্রেয় বোন আমাদের গৌতম বুদ্ধের থেরি, ভাবী আম্রপালি।

পরম পূজ্যভ্রাতা ফুস্য সম্যক সম্বুদ্ধের দেশনা শ্রবণ করার পর ভাবী আম্রপালি চিন্তা করলেন আমার ভাই সম্যক সম্বুদ্ধের কথা বিফলে যাওয়ার নয়, বুদ্ধগণ যা বলেন তা কোনদিনও বিফল হয়নি। আমি মহাদান দেব, বুদ্ধসহ মহাভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিয়ে নারীদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ রূপ সম্পদ, আমি এই সম্পদ প্রার্থনা করব। ভাবী আম্রপালি এইরূপ চিন্তা করার পর পরম পূজ্যভ্রাতার সম্মুখে গিয়ে বন্দনা করলেন শ্রদ্ধাযুক্ত মনে এবং শ্রদ্ধাচিত্তে দু'হাত জোড় করে বুদ্ধকে বললেন ভগবান– আগামীকাল থেকে আগামী সাতদিন পর্যন্ত আপনিসহ মহাভিক্ষুসংঘকে আমি মহাদান দিতে চাই আপনি আমার ফাং গ্রহণ করুন। ভগবান ফুস্য বুদ্ধ মৌনভাবে (নীরবে) ফাং গ্রহণ করলেন। পুণ্যবান মহাপুরুষ-পূজ্যভ্রাতা ফাং গ্রহণ করেছেন বুঝতে পেরে ভাবী আম্রপালি বুদ্ধকে বন্দনা করে সেখান থেকে চলে গেলেন। ভাবী আম্রপালি সেখান থেকে যখন চলে যাচ্ছিলেন– তখন তার মনে দানের কথা বাদে আর কোনকিছুই চিন্তার স্থান ছিল না। তিনি কেবল একটি কথায় ভাবতে লাগলেন- ওহো! আগামীকাল থেকে আমি আগামী সাতদিন বুদ্ধসহ মহাভিক্ষুসংঘকে মহাদান দেব। তিনি এই কথা যতচিন্তা করতে লাগলেন তার অন্তর তত প্রসন্ন হতে লাগল। ভাবী আম্রপালি এই ভাবনাটি অন্তরে স্থান দিয়ে একচিত্তে, খুশিতে আত্মহারা হয়ে এক সপ্তাহের জন্য নিজের হাতে দানীয়বস্তু জোগাড় করলেন। কর্মচারী সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধ এবং ভিক্ষুসংঘের বসার আসন নিজের হাতেই প্রস্তুত করালেন। এদিকে রাত শেষ হতে চলল, তিনি খুশিতে ঘুমাতে পারলেন না। ভাবী আম্রপালি রাত শেষ হওয়ার আগেই ঘুম থেকে অর্থাৎ বিছানা বা পালঙ্ক থেকে উঠে পরলেন এবং বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের জন্য উত্তম উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করলেন। এদিকে সকাল হতে চলল, আর ভাবী আম্রপালির রান্না ও শেষ প্রায়, তিনি রান্না শেষ করে, সবকিছু ঠিক আছে

কিনা পরীক্ষা করার পর স্নান করতে চলে গেলেন। স্নান সেরে উত্তম উত্তম পোশাক পরিধান করলেন,এবং দিবাপ্রহর (সকাল ৬:০০টা থেকে ১০:০০টা মধ্যবর্তী সময়) হয়ে গেলে একজন কর্মচারীকে ডেকে বললেন– যাও ভাই/বোন বুদ্ধের কাছে যাও গিয়ে বন্দনা করে বুদ্ধকে বল যে, খাদ্য প্রস্তুত হয়েছে। কর্মচারীরা তাই করলেন। বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে পাত্র-চীবর গ্রহণ করতে বললেন এবং নিজে ও পাত্র-চীবর গ্রহণ করলেন। বুদ্ধ যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে নিজের আসনে বসলেন এবং ভিক্ষুসংঘরাও নিজ নিজ আসনে বসে পরলেন। ভাবী আম্রপালি পূজনীয় ভ্রাতা বুদ্ধকে বন্দনা করে ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা করলেন। তারপর নিজের হাতে উত্তম উত্তম প্রস্তুতকৃত আহার্য দ্বারা বুদ্ধ এবং ভিক্ষুসংঘকে পরিবেশন করলেন। আহার সমাপ্ত হলে নিজের হাতে মহাদান দিলেন। এভাবে একসপ্তাহ বুদ্ধসহ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান-দিলেন ভাবী আম্রপালি। একসপ্তাহ শেষান্তে মহাদানের শেষ দিনে মহাদান দেয়ার পর বুদ্ধকে বন্দনা করে বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করলেন ভাবী আম্রপালি। ভান্তে ভগবান আমি যে একসপ্তাহ মাহাদান দিয়েছি এই পুণ্যের প্রভাবে আমি যেন জন্ম-জন্মান্তরে রূপলাবণ্য হতে পারি, আমার রূপসম্পদ যেন চন্দ্র-সূর্যকেও হার মানায়, ভাবী আম্রপালি বুদ্ধের কাছে এই প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধ তথাস্তু বলে (তাই হোক) প্রার্থনা আনুমোদন করে আশীর্বাদ করলেন। ভাবী আম্রপালি আরও এভাবে দীর্ঘবছর মহাদান দিয়েছিলেন।

প্রাণী 'জন্মিলে মরিতে হবে' এটাই চিরন্তন সত্য, কোন কিছুই স্থায়ী চিরন্তন থাকতে পারে না। ভাবী আম্রপালিও যথাসময়ে পরিপূর্ণ বয়সে পরলোক গমন করলেন। তিনি সাথে সাথে স্বর্গের সুরম্য প্রাসাদ বিমানে উৎপন্ন হলেন।

পুণ্যফল অনুসারে আম্রপালি স্বর্গীয় প্রাসাদ বিমানে বহুপরিচারিকাসহ পঞ্চকামগুণ ভোগ করেছিলেন বহুবছর (কয়েক লক্ষ বছর)। আমরা প্রত্যেকেই জানি যতদিন তৃষ্ণা ক্ষয় হয় না ততদিন সত্ত্বগণ সুখ-দুঃখে দিনাতিপাত করে। তৃষ্ণা হচ্ছে চাওয়া-পাওয়া, এই চাওয়া-পাওয়ার বিপরীত ফল-ত্যাগের অবস্থান যতদিন না বুঝতে পারে না ততদিন দুঃখ বাড়তেই থাকে আর কমে না। অর্থাৎ যতদিন অরহত হবে না ততদিন সুখ নেই, শান্তি নেই, আছে শুধু মিশ্র ফল, কিছুক্ষণ হাসি, পরক্ষণে কান্না, ভালো কাজের জন্য বহু প্রশংসা, পরক্ষণে সামান্য ভুলের কারণে নিন্দা, তদ্রূপ-সত্ত্বগণ স্বর্গ লাভ করলেও চির অমর হতে পারেন না, ভাবী আম্রপালির ও তাই হলো- তিনি স্বর্গ থেকে চ্যুত হলেন।

ভাবী আম্রপালির বিচিত্র জীবনের গোপন রহস্য

একটি ফলবৃক্ষ যেমন যতদিন জীবিত থাকে ততদিন, ততবছর ঋতু পরিবর্তন করে করে ফল দেয়, ফল দেয়ার শেষ নেই, ঠিক তদ্রূপ কোন একজন সত্ত্বের অন্তর-জগতেও যতদিন লোভ, দ্বেষ, মোহ- এই ত্রি-শত্রুর ফল 'তৃষ্ণা' বিদ্যমান থাকবে ততজন্ম ঐ ফল বৃক্ষের ঋতু পরিবর্তন করে করে ফল দেয়ার ন্যায় সে পুদগলকেও জন্ম-মৃত্যু শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে হবে। সে হোক মানুষ, কিংবা দেবতা বা কোন মহৎ ব্যক্তি অথবা অন্যকোন প্রাণী তার জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে রেহাই নেই এটাই চিরন্তন বাস্তব সত্য কথা।

সেসময় জগতের দেব-মানবের হিতের জন্য, সুখের জন্য, মঙ্গলের জন্য, সত্ত্বগণের অন্তরের অন্ধকার জগতে নৈর্বাণিক আলো জ্বালানোর জন্য জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন সিখী বুদ্ধ। মহাকারুণিক সিখী বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তন শেষ করে দেব-মানবের মাঝে ধর্মপ্রচারকালীন সময়ে স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে ভাবী আম্রপালি জন্ম নিলেন অরুণনামক নগরে।

এক ধনাঢ্য উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে। ভাবী আম্রপালি ব্রাহ্মণবংশীয় কুলকণ্যা কৈশোর জীবনে বেদ শিক্ষা করে বেদধর্মে পারদর্শিতা হলেন। তিনি বেদশাস্ত্র শিক্ষা করে যে শিক্ষাটি অর্জন করেছিলেন তা উপাসক-উপাসিকাদের (সাধারণ মানুষের মাঝে) যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ধর্মপ্রচার করতে লাগলেন। এমনভাবে ধর্মপ্রচার করার সময়কালীন কোন এক জায়গায় যুক্তিতর্কে ধর্মপ্রচার করতে গিয়েছিলেন। সেই গ্রামের লোকজনদের যুক্তি-তর্কে হারিয়ে অহংকারে আত্ম-প্রশংসায় পঞ্চমুখ করতে লাগলেন। তাকে আত্ম-প্রশংসায় পঞ্চমুখ দেখে লোকজন বলতে লাগলেন- তুমি আমাদেরকে তর্কে হারাতে পারলেও কিন্তু একজনকে হারাতে পারবে না। লোকজনের মুখ থেকে এই কথা শোনার পর তার শরীরের রক্ত যেন আগুন হয়ে উঠল। ভাবী আম্রপালি রাগী আর অহঙ্কারে সফীত হয়ে বলে বসলেন– কে সেই ব্যক্তি যিনি আমার থেকেও জ্ঞানী আর পণ্ডিত? তার নাম বলুন- গ্রামবাসীরা বলল- তিনি হলেন ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও আচরণ সম্পন্ন, সুগত ও ত্রিকালদর্শী, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মানবের শিক্ষক বুদ্ধ এবং ভগবান। তিনি সেই নবগুণ সম্পন্ন মহাকারুণিক সিখী বুদ্ধ। বুদ্ধের এই প্রশংসা শুনে ব্রাহ্মণবংশীয় কুলকণ্যা আর এক মুহূর্তও দেরী করলেন না– ভগবান সিখী সম্যক সম্বুদ্ধ যেখানে অবস্থান করছেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভাবী আম্রপালি ব্রাহ্মণ কুলকন্যা সেখানে যেতে না যেতেই প্রশ্ন জুড়ে দিলেন বেদশাস্ত্র থেকে। সেখানে যে শুধু বুদ্ধ ছিলেন তা নয়, সেখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকাও ছিলেন। সবাই ব্রাহ্মণ কুলকন্যার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন, ভগবান সিখী বুদ্ধও তার প্রশ্নগুলো নীরবে শুনলেন- ব্রাহ্মণকন্যার প্রশ্ন শেষ হলে বুদ্ধ সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন এবং ব্রাহ্মণকন্যাও

পরাজয় স্বীকার করে বুদ্ধের কাছে প্রব্রজ্যার প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধ ব্রাহ্মণ কন্যাকে ভিক্ষুণীনিবাসে পাঠালেন এবং একজন ভিক্ষুণীকে আদেশ করলেন সাথে গিয়ে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষিত করানোর জন্য। ভাবী আম্রপালি প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ভিক্ষুণী সংঘে প্রবেশ করলেন। তিনি ভিক্ষুণী হওয়ার পর কঠোর সাধনা করতে লাগলেন। ভাবী আম্রপালি ভিক্ষুণী একাকিনী হয়ে নির্জনে বসে চারিস্মৃতি প্রস্থান ধ্যান করতে করতে শরীরের মর্মতা এবং গর্ভবাসে জন্ম নেয়া দুঃখজনক এই বিষয়গুলো উপলব্দি করলেন। কিন্তু অর্হৎ হতে পারলেন না। একদিন বহু ভিক্ষুণীসংঘসহ সম্যক সম্বুদ্ধ সিখী বুদ্ধকে বন্দনা ও পূজা দিতে গিয়েছিলেন। ভগবান সিখী বুদ্ধকে বন্দনা করে তারপর পারিভোগিক (চৈত্য) বোধিবৃক্ষকে বন্দনা ও পূজা দিতে গেলেন। বোধিবৃক্ষকে বন্দনা ও পূজা দেওয়ার পর প্রদক্ষিণ করার সময় ভাবী আম্রপালি ব্রাহ্মণ কুলকন্যা এমন একটি দুষকর্ম করে বসলেন যা কখন ও ক্ষমাযোগ্য নয়। তিনি বুঝতে পারলেন না এই কর্মটি তাকে কতটা ভয়ঙ্কর ফল দেবে, তিনি ছিলেন অজ্ঞ এবং অহংকার পূর্ণা, তিনি ক্ষমা চেয়ে নিলেও বা তাকে ক্ষমা করে দিলেও তার বিবেকবোধ তাকে ক্ষমা করত না। কারণ তিনি এমন একজনের ওপর হীনভাবা প্রকাশ করেছেন যার কোন লোভ, দ্বেষ, মোহ নেই।

ঘটনাটি হচ্ছে– বোধিবৃক্ষকে বন্দনা ও পূজা দেয়ার পর ভাবী আম্রপালিসহ আরও বহু ভিক্ষুণীসংঘ বুদ্ধের গুনগাথা এবং বোধিবৃক্ষের গুণের কথা স্মরণ করতে করতে বোধিবৃক্ষের চারপাশে প্রদক্ষিণ করছিলেন। সেই ভিক্ষুনীসংঘের মাঝে সবাই যে, সাধারণ ভিক্ষুণী (মার্গফলবিহীন) ছিলেন তা নয়। সেখানে মার্গফললাভী অর্হৎ ভিক্ষুণীও ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত ভাবী আম্রপালির সামনে সামনে যে ভিক্ষুণীটি প্রদক্ষিণ বা হাঁটছিলেন তিনি ছিলেন মার্গফললাভী অর্হৎ ভিক্ষুণী। সেই ভিক্ষুণীটি ছিলেন বয়স্ক এবং একটু সর্দি কাশিতে ও ভুগছিলেন। বয়স এবং রোগের কারণে বুকে বা গলায় কফলেগে থাকায় হঠাৎ হাশি-কাশি পাওয়ায় ভিক্ষুণীটি কাশি দিলেন। ঐ অর্হৎ ভিক্ষুণীটি হাশি-কাশি দিলে দুর্ভাগ্যবশত নাক থেকে এবং মুখ থেকে অল্প সিকনি ও অল্প কফ বোধিবৃক্ষের চৈত্যাঙ্গনে গিয়ে পরে। ভাগ্য যখন খারাপ যায়, কর্মের বন্ধনে যখন লিখন থাকে তখন কি আর করার থাকে। ভাবী আম্রপালি তখন দেখতে পেলেন না। সেই প্রদক্ষিণটি শেষ করে আরেকবার যখন প্রদক্ষিণ করছিলেন তখন ভাবী আম্রপালি ঐ সিকনি আর কফটুকু দেখতে ফেলেন। দেখার সাথে সাথে তার শরীরের রক্ত গরম হয়ে মাথায় উঠে আসে। তিনি আর ক্রোধ আটকাতে পারলেন না। সেখানে তোড়গোল বেধে ফেললেন। তিনি যেন আচমকায় বলে উঠলেন হায়! হায়! কোন 'বেশ্যা' কোন অনাচারিণী, জিনশাসন দূষিতা' এমনতর পবিত্র স্থানে অশুচি সিকনি ফেলেছে।

ভাবী আম্রপালির এই বিদ্বেষপূর্ণ আর ঘৃণা বাক্য তার জীবনে মহাপ্রলয় (ধ্বংযজ্ঞ) হয়ে দাঁড়াল। এই সামান্য একটি কারণে, এই সামান্য একটি ভুলের জন্য তিনি সংসার ত্যাগ করে যে সুখ আর পুণ্য পেয়েছেন তা আর ধরে রাখতে পারলেন না। এই একটি ভুলই তার সুখময় জীবনে, ভাগ্যের দরজায় পর্দার মতো করে অন্ধকারভাবে ঘিরে ধরল। যেন নাগলোকের কোন নাগ বা নাগিন তাকে ছোবল মারল। তার কর্মের শরীরে যে বিষ প্রবেশ করেছে এই বিষ যে, যেমন- তেমন বিষ নয়। এই বিষ পানি করার কারও সাধ্য নাই, কি কবিরাজ, কি বৈদ্য, কেউ এই বিষ নির্ণয় করতে পারেন না। এই বিষাক্ত ছোবলটি যে খাবে তার কপাল পুড়বে পুড়বেই। এটাই চিরন্তন ধমর্তা, চিরন্তন সত্যতা।

ভাবী আম্রপালি অর্হৎ ভিক্ষুণীর ওপর ক্রোধপূর্ণ ও বিদ্বেষবাক্য স্থাপন করেছেন বলে পবিত্র বুদ্ধ শাসনে আর বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারলেন না। নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরে পাপভাণ্ডার ভারী হলে কিছুদিন পর মৃত্যুরমুখে পতিত হলেন। সাথে সাথে আর্যনিন্দার ফল নরকে গিয়ে উৎপন্ন হলেন।

ভাবী আম্রপালি অর্হৎ ভিক্ষুণীর ওপর বিদ্বেষ পোষণ ও নিন্দাজনিত পাপের ফলে কল্পকালব্যাপী নরক যন্ত্রণা ভোগ করার পর জন্ম নিলেন মানবকূলে উচ্চবংশীয় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে- হলেন নারী। অতীত জন্মে দানের পুণ্যর ফলে জন্ম নিলেন উচ্চবংশে এবং অতীতে অশুচি ভাবনা দ্বারা শরীরের মর্মতা ও গর্ভবাসের যন্ত্রণা উপলব্দিজনিত পুণ্যের ফলে সংসারের প্রতি তার মন আকৃষ্ট হল না- তিনি হলেন তপস্বীনি। ভাবী আম্রপালির দুঃখ যে, এখানে শেষ নয়- দুঃখগুলো তো সবেই শুরু।

তিনি (ভাবী আম্রপালি) সুদীর্ঘকাল তপস্যা করেও কোন ফলাফল পেলেন না। ক্রমে বয়সবৃদ্ধি হওয়ার পর পরলোক গমন করলেন- জন্ম নিলেন মানবকূলে– তাও আবার নারী হয়ে।

নারী হয়ে কি সুখী হতে পারলেন? হতে পারলেন না। অর্হৎ ভিক্ষুণীকে বেশ্যা বলার পাপের ফলে তাকে পতিতাগিরী করতে হলো। একজন পতিতা হওয়া যে কতটা কষ্টকর সেই ভাষা কারও কাছে প্রকাশ করতে পারলেন না ভাবী আম্রপালি।

পাদটীকা:
একজন পতিতা শারীরিক, মানসিকভাবে কতটা কষ্ট ভোগ করে তা উপলব্দি করার জন্য "শিক্ষিতা পতিতার আত্ম-চরিত" এই বইটি পড়বেন।
(কুমারী-শ্রীমতী মানদা দেবী প্রণীত)

কারণ তিনি যে, কর্মের কাছে শিকারিণী। তার সুখ কর্ম কেড়ে নিয়েছে। ভাবী আম্রপালি সু-দীর্ঘকাল বসবাস করেছিলেন এই নরকতুল্য জীবনে। এই কর্মটির জন্য তাকে যে, (ভাবী আম্রপালি) কত হাজার কথা শুনতে হতো গণনাতীত। কর্মের কাছে হেরে গিয়ে তারপরও তিনি সেই কাজটি ছাড়তে পারলেন না। এই জন্যে যে কর্মফল শেষ হবে তা কিন্তু নয়। তার জন্য যে আরও অসংখ্য জন্ম অপেক্ষা করছে। এভাবে তিনি দীর্ঘকাল জীবন অতিবাহিত করার পর অবশেষে সেখান থেকে চ্যুত হলেন।

বিচিত্র কর্মেরই বিচিত্র ফল, কর্মের প্রভাবে মানুষ, দেবতা, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব সবাইকে-কিনা হতে হয়, সাধারণ চিন্তায় আমরা যে কাউকে হঠাৎ কোন অদ্ভুদ কর্মের জন্য ঐ দোষী ব্যক্তিকে তিরস্কার করি, সত্যি বলতে তিনি কিন্তু ইচ্ছে করেই নিন্দনীয় কর্মগুলো করেন না, তার পেছনে রয়েছে বিশাল একটি কারণ- তা হলো– অতীত কর্ম এবং সংস্কার, বর্তমান ও অতীত কর্ম সংস্কারের কাছে হেরে গিয়েই সেই ব্যক্তি নিন্দনীয় কর্ম করতে বাধ্য হয় এটাই তার নিয়তি। সকল ব্যক্তিগণকে (স্বত্ত্ব) ঠকানো সম্ভব, প্রতারণা করে পালিয়ে বেড়ানো যায়, কিন্তু আপনি আপনার কর্মের নিয়তি থেকে পালাতে পারবেন না - পৃথিবীর শেষ প্রান্তে লুকিয়ে যান, চুরাশি হাজার যোজন মহাসমুদ্রে লুকিয়ে যান-আপনার রেহাই নেই, সেটা আপনার ভালো কর্মও হতে পারে আবার খারাপ কর্মও হতে পারে- যেমন কর্ম করবেন সেই অনুসারেই কর্মের ফলটি আপনার কাছে ধরা দেবেই দেবে এটাই তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

ভাবী আম্রপালি অতীত জন্মে হয়েছিলেন বুদ্ধভগ্নি, ক্ষত্রিয়কূলকন্যা, ব্রাহ্মণ কন্যা, ভিক্ষুণী ও ছিলেন আর দীর্ঘ বছর সাধনা ও করেছিলেন। মহাদান দিয়েছিলেন মানবকূলে, স্বর্গীয় দেবীও হয়েছিলেন, বেদসহ বিবিধ জটিল জটিল ধর্মের গভীরতত্ত্ব লাভ করেছিলেন। এসব পুণ্যকর্মের জন্য তার থাকা উচিত ব্রহ্মলোকে বা মার্গফলাদি লাভ করে নির্বাণ লাভ করার কথা কিন্তু তিনি সেগুলো লাভ করলেন না। ভাবী আম্রপালি পেয়েছিলেন তার উল্টোটা- একটি মাত্র সাধারণ কর্মের জন্য তাকে আজ বারবণিতা, বেশ্যা, নর্তকী, নগরশোভিনী, জনসাধারণের মনোরঞ্জনকারিণী ও কতো কি টাইটেল লাভ করতে হলো। এসব নামের টাইটেল কি খুব প্রশংসনীয়? না, এসব নামগুলো যেমন লোমহর্ষক, তার থেকেও ভয়াবহ ও লোমহর্ষকর হচ্ছে এই কাজগুলো এবং তার ফলগুলো।

ভাবী আম্রপালি কল্পকালব্যাপী নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন, গণিকাবৃত্তি ও করেছিলেন এতকিছু হওয়ার পরেও কিন্তু কর্মের শেষ কই? জন্ম-মৃত্যু, জন্ম-মৃত্যু করে করে তাকে যে, দশহাজার (১০,০০০) জন্ম বারবণিতা, বেশ্যা, নর্তকী, গণিকাধর্ম পালন করতে হলো, এত কিছু হওয়ার পরও তার উপযুক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ফল শেষ হল না-এটাই খুব আশ্চর্যের বিষয়।

তিনি পতিবৃত্তি-গণিকাধর্ম পালন করে করে পার করলেন কল্পকালব্যাপী। তারপর জগতে আবির্ভূত হলেন "ভগবান কাশ্যপ সম্যক সম্বুদ্ধ"।

কাশ্যপ সম্যক সম্বুদ্ধ শাসনামলে ভাবী আম্রপালি জন্ম নিলেন এক উচ্চবংশীয় পরিবারে। যখন থেকে পুজ্যভ্রাতার ফুস্য বুদ্ধের কাছ থেকে জন্ম-জন্মান্তরে রূপশ্রী হবার জন্য আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন সেই থেকে নরক বাদে বাকী যত জন্ম নিয়েছিলেন তত জন্ম তিনি এতই রূপশ্রী হয়েছিলেন বলার অপেক্ষা রাখে না। এই জন্যেও তিনি মনোহারী রূপবতী হলেন। পরিবারের সবার আদর, যত্ন, স্নেহে বড় হলেন। একদিন কাশ্যপ সম্বুদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ হয়। ভাবী আম্রপালিদের গ্রামবাসীসহ অন্যান্য গ্রামবাসী সকলে মিলে মিশে একদিন ঠিক করলেন যে সকলের মঙ্গলের জন্য কাশ্যপ সম্যক সম্বুদ্ধকে ফাং করে আনবেন, সকলের আলোচনার সাপেক্ষে তাই করা হল। ভগবান বুদ্ধ, যথাসময়ে এসে হাজির হলেন-এবং আহারাদি সমাপন করার পর সকল ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে আনুপূর্বিক ধর্মদেশনা প্রদান করলেন, যথা: দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা, কামসমূহের দোষের কথা, হীনকূলের কথা-(চার-অপায়ের কথা- তির্যক, প্রেত, অসুর, নিরয়) লোভ, দ্বেষ, মোহের কথা এবং ক্লেশসমূহ পরিত্যাগের প্রশান্তির কথা, ভগবান যখনই জানতে পারলেন যে, পরিষদের উপস্থিত জনতার মন শান্ত হয়েছে। তারপর মোক্ষমার্গ ধ্যান-সাধনার কথা বলে শেষ করলেন। ভগবান বুদ্ধের এই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে ভাবী-আম্রপালি সংসার জীবনের অসারতা বুঝতে পারলেন এবং বুদ্ধের কাছে ভিক্ষুণীত্ব প্রার্থনা করে ভিক্ষুণী ধর্মে প্রবেশ করলেন।

তিনি ভিক্ষুণী ধর্মে প্রবেশ করে সবার থেকে আলাদা হয়ে একাকিনী জীবন যাপন করতে লাগলেন এবং কঠোরভাবে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞার প্রতি মনোনিবেশ করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই ভাবী আম্রপালি ধর্মের স্বাদ, অন্তরের প্রশান্তি কিছুটা লাভ করলেন কিন্তু কোন মার্গফলের অধিকারী হতে পারলেন না। এভাবে তিনি সুদীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য জীবন-যাপন করে পরিপূর্ণ বয়সে পরলোক গমন করলেন এবং সাথে সাথে 'তাবতিংস' স্বর্গীয় ভবনে উৎপন্ন হলেন। তাবতিংস স্বর্গীয় ভবনে উৎপন্ন হয়ে সুখেই কাটালেন সুদীর্ঘকাল, মনুষ্য গণনায় এই স্বর্গের স্বত্ত্বগণের আয়ুষ্কাল তিন কোটি ষাট লক্ষ বছর।

কিন্তু ভাবী আম্রপালির ও সুখময় জীবন চিরদিন কাটল না পূণ্যশক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পর তার পুরো শরীর ক্লান্তিমগ্ন, দিব্যবর্ণ রাজকীয় পোশাক মলিন হতে শুরু করল, দিব্যজ্যোতি সম্পন্ন শরীরে ময়লা দেখা দিল। ভাবী আম্রপালি 'তাবতিংস' স্বর্গভবন থেকে চ্যুত হলেন।

সেই পুণ্যলগ্নে ধরণীর ধুলো পবিত্র করে আবির্ভূত হয়েছেন বর্তমানের গৌতম সম্যক সম্বুদ্ধ। রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করে সিদ্ধার্থ তখন বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন; তাঁর প্রবর্তিত ধর্মচক্রের অমোঘ বাণী দেবলোক থেকে মর্ত্যলোক সর্বত্র ধ্বনিত

হচ্ছে। ঠিক সেই সময়ে 'তাবতিংস' স্বর্গের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রদেবী আম্রপালি।

আজ নিয়তির অমোঘ বিধানে তাঁর অর্জিত পুণ্যফল আজ ক্ষয়িষ্ণু। দিব্যদেহের সেই লাবণ্য যেন ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছে, অঙ্গে পূর্বের ন্যায় আর বল নেই; তপ্ত কাঞ্চনের মতো দেহের সেই সুবর্ণ দ্যুতি ক্রমেই ধূসর হয়ে উঠছে। তাঁর ব্যাকুল পরিচারিকা ও সহচরীরা বিষণ্ন বদনে তাঁকে ঘিরে ধরল। তারা কম্পিত স্বরে নিবেদন করল, "হে দেবী, আপনার আয়ুষ্কাল সমাপ্ত প্রায়। অতীতে স্বর্গচ্যুত দেবতাদের দেহে যে অশুভ লক্ষণগুলো প্রকাশ পেত, আপনার শরীরেও আজ সেই একই ছায়া দৃশ্যমান। আপনি বিচলিত হবেন না দেবী, মনের সকল গ্লানি ও দৌমনস্য ঝেড়ে ফেলে আপনার সঞ্চিত কুশল কর্মগুলো স্মরণ করুন।"

দেবকন্যাদের বিলাপের মাঝেই দেবী আম্রপালির স্মৃতিপটে ভেসে উঠল তাঁর অতীত জন্মের এক সঙ্কল্প। পূর্বতন কাশ্যপ সম্যক সম্বুদ্ধের শাসনামলে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ধ্যানমগ্ন ভিক্ষুণী। সেই জন্মে সাধনার গভীর স্তরে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জঠরবাস বা গর্ভযন্ত্রণার তীব্র কষ্ট। তাই তিনি অধিষ্ঠান করেছিলেন- ভবিষ্যতে যেন তাঁকে আর কোনো মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নিতে না হয়; তাঁর জন্ম যেন হয় 'ঔপপাতিক' বা অযোনিজ উপায়ে। অতীতের সেই মহান সংকল্প মনে পড়তেই দেবী আম্রপালি জাগতিক সকল মায়া ছিন্ন করলেন। তাঁর চিত্ত মুহূর্তেই সেই পুরাতন ধ্যানময় নিস্তব্ধতায় নিমগ্ন হলো। আম্রপালি অমরাবতীর ঐশ্বর্য ত্যাগ করে, 'তাবতিংস' স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে তিনি মর্ত্যের সেই সময়ের বিশ্ববিখ্যাত বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র বৈশালীনগরীতে এক দিব্য মানবী রূপে আবির্ভূত হলেন।

বৈশালীনগর ও প্রাচীন এক জাতির উদয় ও তার প্রাচীন ইতিহাস

প্রতিটি স্থান, গোত্র জাতির নামকরণের পেছনে বিশাল একটি কাহিনী লুকিয়ে থাকে। এই রীতি-নিয়ম কল্পকালব্যাপী (আজও) চলে আসছে, চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। যখন থেকে মানুষ সভ্যতালব্দ হয়েছে তখন থেকে নাম, গোত্র, বংশ পরম্পরা চিহ্নিতকরণের জন্য এবং এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের ইতিহাস বুঝার জন্য, জানার জন্য এই নিয়ম প্রচলমান। মানুষ যতই সভ্যতার উন্নতির শিখরে উত্থাপিত হোক না কেন কিন্তু বংশ পরম্পরা কিছু স্বভাব ভুলতে পারে না, কিছু বংশগত নীতি- আচার আচরণ ধরে রাখতে হয়, যা কখনো ভোলা যায় না। সেই রীতি-নিয়ম যদি ভুলে যায় তাহলে সেই বংশগোত্রের মানুষ একতা থাকতে পারে না। একাত্বতা হারিয়ে অবনতির দিকে ধাবমান হতে থাকে। পরে একদম স্মৃতি চিহ্ন পর্যন্ত লুকিয়ে যায় ইতিহাস থেকে। এখানে পূর্বপুরুষ বা বংশগত রীতি-নিয়ম বলতে কি বোঝানো হয়– যৌথ কর্ম সম্পাদন, এক জনের সমস্যাকে দশজনের সমস্যা মনে করে সকলে সম্মিলিতভাবে সমাধান করা। কুল গৌরব বংশ মর্যাদা হানী হয় এরূপ কর্ম না করা, বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এ ত্রিরত্নের স্মরণে স্মরণান্বীত হয়ে বুদ্ধের শাসন উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির কর্ম সম্পাদন করা, মাতা-পিতা ও বড়জনদের সম্মান করা, তাদের সাথে তর্ক না করা, যেকোন মাতৃজাতির সম্মানহানী হয় এরূপ কর্ম না করা এবং যে কর্ম করলে পুরোবাসী তথা বিশ্ববাসী নিন্দা করে এরূপ কর্ম সম্পাদিত না করা। (সংক্ষেপিত)

এই নিয়মগুলোই হচ্ছে পূর্ব-পুরুষের বংশ পরম্পরার রীতি-নীতি।

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের মধ্যে একটি গোষ্টির আবির্ভাব ঘটে। শুরুতে তাদের নাম, গোত্র, নগর, শহর কিছুই ছিল না। তাদের আচরণ এবং কর্মদীপ্ততার মাধ্যমেই এসবের উৎপত্তি ঘটেছে সেই গোষ্টিটির নাম হচ্ছে বজ্জি বা বৃজি- লিচ্ছবি জনগোষ্টি। এই লিচ্ছবি জনগোষ্টির নাম এবং নগর উৎপত্তির পেছনে প্রচলিত একটি লোক-কথা বা লোক-কাহিনী বর্ণিত আছে। সুদূর অতীতের কথা– তখন বারাণসী নগরে বা রাজ্যে রাজত্ব করছিলেন রাজা ব্রহ্মদত্ত। প্রাচীনকালে রাজা - বাদশারা বহুপত্নী গ্রহণ করতেন। মানে রাজাদের তখনকার সময়ে অনেক স্ত্রী বা রাণী থাকত। এরকমভাবে রাজা ব্রহ্মদত্তেরও অনেক রাণী ছিল । সে রাণীদের মধ্যে যিনি অগ্রমহিষী অর্থাৎ যাকে রাজা ব্রহ্মদত্ত সবার আগে বিয়ে করেছিলেন, সে বড়রাণী খুবই বুদ্ধিমতী এবং ধর্মশীলা ও ধর্মপরায়ণা ছিলেন। তাই রাজা এবং অন্যান্য রাণীরা বড় রাণীকে খুবই ভালোবাসতেন। একদিন কোন এক পুণ্যকর্ম সম্পাদন করার পর রাণী যখন স্নান করার জন্য স্নানকক্ষে প্রবেশ করেছিলেন তখন একটি শুভ সংবাদের কথা বুঝতে পেরে রাণী খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠেন। তিনি এতই খুশি

হয়েছিলেন যে, ভালো করে স্নানাদি পর্যন্ত করতে না পারার অবস্থা হয়েছিল। কল্পনা-জল্পনার সাগরে ডুব দিয়ে রাণী স্নান করা শেষ করলেন এবং নিজের কক্ষে গিয়ে রাজার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাজা-মন্ত্রী এবং শ্রেষ্ঠীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শেষ করে রাণীর কক্ষে বা রাণীর রুমে প্রবেশ করলেন। রাজা, রাণীর রুমে প্রবেশ করে রাণীকে দেখে একটু অবাক হলেন। কারণ রাজা ব্রহ্মদত্ত এতদিন রাণীকে এত খুশি হতে দেখেননি। তাহলে রাণী কি এতদিন হাশি-খুশি ছিলেন না? ছিলেন! কিন্তু অন্যদিনের চেয়ে রাণী আজকে একটু বেশি খুশি হয়ে বসে আছেন। রাণীর মন উৎপুল্ল হওয়ার কারণও আছে। সাধারণত রাজা-রাণী, মন্ত্রী-মন্ত্রীদেবী, প্রজা-প্রজাদেবী কিংবা কোন সাধারণ ব্যক্তি বা দম্পতি প্রত্যেকেই কেউই অপুত্রক থাকতে চায় না। শুধু মানুষ নয় তির্যক প্রাণীরা পর্যন্ত অপুত্রক থাকতে চায় না (পশু-পক্ষী)।

সেসময় রাজা ব্রহ্মদত্তের প্রধান অগ্রমহিষী তথা বড়রাণীর কোন সন্তান ছিল না। তারা সন্তানহীন দম্পতি ছিলেন। সবার সাথে হাসি-খুশিতে চলাফেরা করলেও কিন্তু মনের ভিতর বিষণ্নতার আগুন অনব্রত জ্বলছিল। স্বাভাবিক জীবনে যারা এখনও অপুত্রক আছেন বা সন্তানহীন আছেন তারাই বুঝতে পারবেন সন্তানহীন ভাবে থাকা কত কষ্টকর, যে কষ্ট কাউকে দেখানো যায় না কেবল অনুভবে অনুভব করা সম্ভব। আমরা বুদ্ধের জীবনী পাঠ করলেও বুঝতে পারি সিদ্ধার্থের জন্মের আগে রাজা শুদ্ধোধন এবং রাণী মহামায়া কতটা মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। সেরকম রাজা ব্রহ্মদত্ত ও রাণী এতদিন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে এসছিলেন। এভাবে থাকতে থাকতে একদিন একটি পুণ্যানুষ্ঠান সমাপ্ত করে রাণী স্নান করার জন্য গেলে তিনি শরীরের অস্বাভাবিক লক্ষণ অনুভব করেন। যেমন বমি বমি ভাব, হালকা হালকা পেটে ব্যথা অনুভব, প্রচুর ক্লান্তি ও ঘুম ঘুম ভাব অনুভব করলেন। অজ্ঞান হয়ে যাবার দিসা দেখা দিল।

রাণী কোনরকম তার রুমে গিয়ে শুয়ে পড়লেন এবং ধাত্রীকে বা চিকিৎসককে ডাকতে বললেন কোন এক পরিচারিকাকে দিয়ে। ধাত্রী আসলেন-এসে নাড়ী পরীক্ষা করলেন এবং চোখ, মুখ, পেট পরীক্ষা করলেন। ধাত্রী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর বুঝতে পারলেন রাণী গর্ভবতী হয়েছেন। তিনি রাণীকে বললেন চিন্তা করার কোন কারণ নেই। আপনার অন্ধকার কোলকে আলোকিত করার জন্য স্বর্গ থেকে এক জ্যোতিময় আলো আসতেছে। রাণী-মা! আপনি গর্ভবতী হয়েছেন।

ধাত্রীর এ কথা শুনে রাণীর রক্ত চলাচল দ্রুতগতিতে চলতে লাগল। তিনি এতই খুশি হয়েছিলেন যে আবেগ সুরে ধাত্রীকে জিজ্ঞেসা করলেন- মা আপনি একটু আগে কি যেন বলেছিলেন- আরেকবার বলুন! ধাত্রী বললেন- রাণী-মা আপনি গর্ভবতী হয়েছেন। এভাবে আলাপ-সালাপ করার পর রাণী ডবল (দ্বিগুণ) পারিশ্রমিক দিয়ে বিদায় দিলেন ধাত্রীকে। ধাত্রী আসা এবং রাণীর যা

যা ঘটনা হয়েছে বা রাণীর গর্ভবর্তী হওয়ার কথা রাজাকে শোনানো হয়নি। কারণ রাণী চেয়েছিলেন সেই কথাটি হঠাৎ বলে রাজাকে চমকে দেবেন।

যেমন চাওয়া তেমনই হলো- ধাত্রী চলে যাওয়ার- কিছুক্ষণ পর রাজা রাণীর কক্ষের দিকে যাচ্ছিলেন। রাণী জানতে পারলেন যে রাজা তার সাথে দেখা করতে আসছেন। তাই তিনি বিছানা থেকে উঠে বসলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত রাণীর কক্ষে প্রবেশ করা মাত্রই চমকে উঠলেন। কারণ রাজাকে দেখামাত্র রাণী বলে উঠলেন– প্রভু আপনি এসেছেন? এসেছেন ভালোই হয়েছে। এমন করে বলছ কেন প্রিয়ে! কিছু কি হয়েছে? না না তেমন কিছু হয়নি। তাহলে এমনভাবে জিজ্ঞেসা করছ কেন? না ইচ্ছে হয়েছে তাই। না না কিছু একটা তো হয়েছে। আর অন্যদিনের চাইতে তোমাকে আজ অনেক খুশি লাগছে। রাণী বললেন আপনি আগে ভালো করে বসুনতো! তখন রাণী রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে মুসকি মুসকি হাঁসছেন। রাজা বিছানায় উঠে বসলেন এবং রাণীর হাত ধরে বললেন– এবার বল বিষয়টা কি? তখন রাণী বললেন আমাদের রাজ প্রাসাদ উজ্জ্বল হতে যাচ্ছে। বিষয়টি রাজা বুঝতে না পেরে বললেন– মানে? এবার রাণী গম্ভীর এবং কোমল সুরে বলতে লাগলেন মানে আমি মা হতে যাচ্ছি-আমি এখন গর্ভবতী। এই কথা শুনে রাজা খুশি হলেন এবং বললেন এ কথা তুমিও না! আমাকে তো ভয় পায়ে দিয়েছিলে। তারপর রাজা-রাণীর গর্ভ সুরক্ষার জন্য, পরি-সেবার জন্য সেবিকা বাড়িয়ে দিলেন, আর যা কিছু করলে একজন মা অর্থাৎ একজন গর্ভবতী মা ও গর্ভের শিশুর কোন উপদ্রব বা কষ্ট না হয় মত সব ব্যবস্থা করে দিলেন। রাণী দশমাস অতি যত্নসহকারে গর্ভ রক্ষা করলেন এবং সন্তান প্রসবের সময় হলে আঁতুরঘরে প্রবেশ করলেন। (একজন প্রসূতি মা এবং তার সন্তান, প্রসবের পর থেকে যতদিন স্বাভাবিক ও সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত যে রুমে অবস্থান করেন সেই রুমকে আঁতুরঘর বলা হয়।) রাণী ছিলেন খুবই পুণ্যবতী। তার কথাবার্তা, আচার-আচরণ এতই মাধুর্য ছিল যে, সবাইকে মুগ্ধ করত। সেই পুণ্যবতী রাণী ভোর বেলাতেই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সমতুল্য একটি মাংসপিণ্ড প্রসব করলেন। তখন ধাত্রী এবং অন্যান্য রাণীরা মাংসপিণ্ডটি দেখে আচমকায় চমকে গেলেন। তারা বলাবলি করতে লাগল যে রাণী-মা মাংসপিণ্ডের প্রসবের কথা জানতে পারলে অন্যান্য লোকেরা তিরস্কার করতে পারে। আমরা এটা চাইনা আমাদের রাণীর বদনাম হোক।

তারপর ধাত্রী ও অন্যান্য রাণীরা, রাণীকে জিজ্ঞেসা করলেন কি করা যায়- সেই মাংসপিণ্ডটিকে। তারা জিজ্ঞেসা করলে রাণী চিন্তা করলেন- ঐদিকে সন্তানের মুখ দেখার জন্য রাজা অধীর আগ্রহে ছটফট করছেন। কিন্তু এদিকে আমি যে এক অভাগিনী। সন্তান কামনায় বিভোর ছিলাম- আর এখন কিনা জন্ম দিলাম একটি মাংসখণ্ড। মহারাণী যে, পুণ্যবতী এবং ভাগ্যবতী, তার পুত্র

এবং কণ্যাও যে অতিশয় ভাগ্যবান এবং ভাগ্যবতী- সেটা রাণী জানেন না। রাণীর সেই বিষয়টি অজানা থাকার কারণে আবার চিন্তা করতে লাগলেন এখন যদি রাজা জানতে পারেন আমি হতভাগিনী সন্তানের পরিবর্তে জন্ম দিয়েছি একটি মাংসখণ্ড। তখনতো রাজার মনে কষ্ট হবে। তখন হয়তো রাজা মনে মনে আমার ওপর ঘৃণা পোষণ করবেন। ছোট রাণীরা ফুটফুটে সন্তান জন্ম দেয় আর ইনি কিনা কি জন্ম দিল। কারণ আমি যে, রাজা ব্রহ্মদত্তের অগ্রমহিষী। মহারাণী এসব চিন্তা করার পর ছোট রাণীদেরকে আদেশ করলেন কেউ জানতে না পারে মত একটি পাত্রে ঢুকিয়ে বা বাক্সে রেখে নদীর জলে ভাসিয়ে দাও। রাণীর আদেশ মত একটি বাক্সে রেখে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হল। সে সময় এক দেবতা সেই নদীর একটি নির্দিষ্ট সীমানায় কোন শীলবান বা পুণ্যবান সত্ত্ব বিপদে পরলে সেই শীলবান সত্ত্বকে রক্ষা করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন– তাদের প্রভুর কাছ থেকে। এদিকে মাংসখণ্ডটি ভাসিয়ে দেয়ার কিছুক্ষণ পর সে রক্ষাকারী দেবতার সীমানা দিয়ে ভেসে যেতে লাগল। তখন সেই দেবতা মাংসখণ্ডটি দেখে তিনি দেবানুভাব বলে বুঝতে পারলেন যে, এটি সাধারণ বস্তু নয়-এটা যে স্বয়ং রাজা ব্রহ্মদত্তের অগ্রমহিষীর সন্তান। তখন দেবতা কি করলেন তার অনুভব বলে সেই বাক্সের মধ্যে লিখে দিলেন যে- এটি স্বয়ং বারাণসীরাজ ব্রহ্মদেত্তের অগ্রমহিষীর সন্তান। এটা যে পাবেন যত্নসহকারে রক্ষা করবেন। দেবতা সেই লেখা লিখে দিয়ে বাক্সটিতে আবার নদীতে ভাসিয়ে দিলেন।

সেসময় কোন এক তাপস হিমালয় থেকে লোকালয়ে এসেছিলেন। সেই তাপসটি গোপালকদের সাথে নদীতীরবর্তী কোন এক স্থানে কুটির নির্মাণ করে অবস্থান করছিলেন। তিনি প্রতিদিন খুব ভোরে স্নান করার জন্য নদীতে যেতেন। তাপস সেদিনও খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন। তিনি স্নান করার সময় দেখতে পেলেন উজান থেকে নিচের দিকে ভেসে আসছে একটি বাক্স। তাপস বাক্সটি দেখে অভাক হলেন- যে বাক্সটির চারপাশ রঙিন কাপড় দ্বারা মোড়ানো। তিনি বাক্সটি ধরে তীরে উঠে এলেন এবং বাক্সের গায়ে দেবতার লিখে দেয়া লেখাটি দেখে সব বুঝতে পারলেন।

তাপস বাক্সটি তীরে রেখে স্নান সম্পন্ন করার পর আসার সময় বাক্সকেও সঙ্গে কুটিরে নিয়ে এলেন। তিনি বাক্সসহ মাংসপিণ্ডটিকে এনে একটি পরিষ্কার জায়গায় রেখে দিলেন। আর যেন পিপড়া এবং পোকা-মাকড়ের দ্বারা নষ্ট না হয় সেরকম ব্যবস্থা করলেন। এভাবে সপ্তাহ দু'য়েক অতিবাহিত হওয়ার পর মাংসখণ্ডটি দু'টি মাংসখণ্ডে বিভক্ত হল। তাপস তা দেখে আরেকটি বড় সাইজের নতুন বাক্সে যত্নসহকারে মাংসখণ্ড দু'টো একসাথে রেখে দিলেন। তারপর মাসখানেক কেটে যাওয়ার পর তাপস লক্ষ্য করলেন যে মাংসখণ্ড দু'টি সমানভাবে লেভেল হয়ে গেছে। তিনি আর ও লক্ষ্য করলেন যে, দুটি

মাংসখণ্ডে চারটি, চারটি করে মোট আটটি গুটি হয়ে হাত-পা গজাচ্ছে। এভাবে আরও মাসখানেক কেটে যাবার পর তাপস দেখলেন যে, সেই মাংস খণ্ডগুলো একটি ছেলে এবং আরেকটি মেয়ে রূপধারণ করল। শিশু দুটির মুখমণ্ডল খুবই মায়াবী চেহারার অধিকারী ছিল। তাপস শিশুদ্বয়কে দেখে তার মনের মধ্যে মায়া জাগ্রত হল। শিশু দুটোই এতই পুণ্যবান এবং পুণ্যবতী ছিল যখন থেকে তাদের দুধপান করার বয়স হল তখন থেকে তাপসের হাতের বুড়ো আঙ্গুল থেকে দুধ উৎপন্ন হতে লাগল।

তারপর তাপস শিশু দুটির বিষয়ে গো-পালকদেরকে অবগত করলেন। সেদিন থেকে তাপস ভিক্ষার জন্য বের হলে লোকজন তাপসকে আহারের সাথে দুধভাত দিতে লাগলেন। তাপস নিজে ভাত এবং অন্যান্য আহারগুলো খেয়ে নিতেন বাকী দুধটুকু-শিশু দু'টিকে পান করাতেন। তাদেরকে যখন দুধপান করানো হত তখন একটি বিষয় দেখে তাপস খুবই চমকে গেলেন। তিনি দেখলেন যে শিশুদের চামড়া খুবই পাতলা, যার কারণে তাদেরকে যেসব আহার কারানো হতো সবগুলোই বাইরে থেকে দেখা যেত। তবে এই বিষয়টি কেউ কেউ ভাষা বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বলে থাকেন যে সেলাই করে রাখার ন্যায় তাদের চামড়াগুলো আত্মবিস্মৃতভাবে একীভূত হওয়ার কারণে তারা যা খায় তা ঝাপসাভাবে দেখা যেত।

যেমন: কোন পুরনো ছবি বা পেইন্টিং অতি পুরনো হতে হতে একসময় চেহারা স্পষ্ট বা পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না সেই অবস্থাকে তখন নিচ্ছবিতা বলা হয়। (রং ঝাপসার কারণে চামড়াহীন বলা হচ্ছে এখানে) অথবা লীনচ্ছবিতা চামড়া অতিশয় পাতলা হওয়ার কারণে এবং পেটের ভেতরের ঝাপসা দৃশ্যটার কারণে ঐখানকার অধিবাসীরা নিচ্ছবিতা বা লীনচ্ছবিতা বলতে বলতে "লিচ্ছবি" নামটির উৎপত্তি ঘটে।

বি.দ্র. আমার দৃষ্টিকোণ থেকে লিচ্ছবি নামের উৎপত্তির কারণ– লিচ্ছবি দুই শিশুর জন্ম স্বাভাবিকভাবে না হয়ে ভিন্নভাবে তাদের জন্ম হয়েছে। বর্তমান বিজ্ঞান বলছে- কোন শিশু পরিপূর্ণ গর্ভ হওয়ার আগে যদি জন্ম নেয় তাহলে তাদের শরীরে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন– যে সমস্ত শিশু মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নেয়- তারা মাতৃগর্ভে থাকতেই তাদের শরীর মায়ের মাধ্যমেই পুষ্টি লাভ করে। মা যে খাদ্য গ্রহণ করে সে খাদ্য থেকে পুষ্টি লাভ করে গর্ভে থাকা শিশুর শরীর পরিপূর্ণ রূপে গঠিত হয়। একটি শিশুর শরীর গঠনক্রিয়া হয় এভাবে যেমন– মাতা-পিতার মিলন থেকে "কলল" (পানি সদৃশ্য পদার্থ বা অনু) সেখান থেকে মাংস ধোয়া জলের মতো রূপ নেয়। তারপর রক্তপিণ্ড রূপধারণ, তারপর মাথা, হাত, পা, চামড়া, চোখ, হাড় (অস্থি) এগুলো ধীরে ধীরে গঠিত হয়। এগুলো গঠিত হওয়ার পরও একটি শিশু বহুদিন গর্ভে অবস্থান নিয়ে থাকে-শরীরের প্রতিটি অংশ শক্ত হওয়ার

জন্য। যেমন– একটি আম ফুল থেকে ফল, তারপর ধীরে ধীরে যত বড় হয়, আমের ভিতরে বীজ নরম থেকে শক্ত হতে থাকে। তারপর বীজের চারপাশে একটি ব্লেডার তৈরি হয়, সেই ব্লেডার থেকে আমের মাংসের ভেতরে ভেতরে কেশ জন্ম নেয় তথা তৈরি হয়। এরূপ গঠন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ গাছের পুষ্টিগুণের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। তদ্রূপ একটি মানব শিশুও মায়ের পুষ্টিকর খাদ্যের মাধ্যমেই গর্ভে বড় হয়। আর এই শিশু গর্ভপরিপূর্ণ হওয়ার আগে যদি জন্ম নেয় তখন চামড়া পাতলা হয়।

চুল কম হয়, হাড়ের গঠন ভিন্ন হয়, ব্রেন কম হয়, বুদ্ধিদীপ্ত কম হয়, শরীর গঠন ছোট হয়, শরীর রুগ্ন হয়, দুর্বল হয়, শরীরে যে পরিমাণ পুষ্টি ধারণ করা দরকার তা তিনি ধারণ করতে পারে না, তাই তাদের শরীর স্বাভাবিক না হয়ে অস্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায়।

তদ্রূপ লিচ্ছবি শিশুরাও পরিপূর্ণভাবে গর্ভে জন্ম হয়নি বলে, মায়ের গর্ভ বাদ দিয়ে বাহিরের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় তাদের শরীর গঠন হয়েছে বলে তাদের শরীরের চামড়া পাতলা হয়েছে, মাংস পরিপূর্ণভাবে গঠিত হয়নি, পুষ্টি পায়নি, মেজাজ খিটখিটে হয়ে ওঠে।

সবকিছু মিলিয়ে এক কথায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায়-মায়ের গর্ভে জন্ম না নিয়ে মাংসপিণ্ড থেকে প্রাকৃতিকভাবে মানব শিশুর রূপধারণ করেছে বলেই চামড়া আর মাংস একীভূতভাবে স্বচ্ছতা হওয়ার কারণে তারা যা খেত তার মাধ্যমে নাড়িভুড়ি ফুলে গিয়ে বাইরে থেকে ঝাপসাভাবে প্রকাশ পেত এই জন্যে মনে হয়, নিচ্ছবিতা বা লীনচ্ছবিতা শব্দ থেকে লিচ্ছবি শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে।

তাপস শিশুদ্বয়কে পরম যত্নে লালন-পালন করতে লাগলেন। তিনি সন্ন্যাসী হয়েছেন তো কি হয়েছে তার অন্তরে তো আর মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার অভাব হয়নি। বরঞ্চ তাপসের অন্তরে দয়া প্রেম মমতায় পরিপূর্ণ ছিল। একজন মা তার আপন প্রিয় পুত্রকে যেভাবে স্নেহচুম্বন দিয়ে যত্ন করে স্নান করানো, কাপড় ধোয়া, পায়খানা প্রস্রাবের কাপড় ধুয়ে ফেলা, নিজহাতে আহার করানো এসবকিছু তাপস করতে লাগলেন। তাপস বা সন্যাসীগণ পরের ওপর নির্ভরশীল, ভিক্ষাব্রতই সন্যাসীদের জীবিকার মূলপন্থা।

তাপস ভিক্ষার জন্য বের হতেন সকাল বেলায় এবং ফিরে আসতেন বিকেল বেলায়। তাই সেসময় শিশুদের দেখাশুনা করার মত কেউ থাকে না। আবার শিশুদের দেখাশুনা করার দায়িত্বে পড়ে থাকলে তাপসের জীবন-ধারণের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি করা হয় না। তাপস পড়ে গেলেন বিশাল এক সমস্যায়। তিনি গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন কি করা যায়। অন্য ভাবনা-চিন্তা করার পরও তাপস সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না। তাপস নিরুপায় হয়ে একদিন নদীর তীরে অবস্থানরত গো-পালকদের সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করলেন। তাপসের সব কথা শুনে গো-পালকেরা বললেন, শ্রদ্ধেয় ভান্তে সন্ন্যাসীদের পক্ষে

শিশু সন্তান লালন-পালন করা কঠিন, ঝামেলাময় হয়। যদি শিশু লালন - পালনও করে থাকে তাহলে সন্ন্যাসীদের মূল কর্তব্যকর্মগুলো করতে পারেন না। আপনি একটি কাজ করুন শিশু-দুটিকে আমাদের দিয়ে দেন। আপনি যেভাবে যত্ন করতেন আমরাও সেভাবে পরমযত্নে লালন পালন করব। এমনিতে আমাদের অনেকগুলো গোয়ালী গাভী গরু আছে দুধের অভাব হবে না। আপনি আপনার আপন সাধনায় মনোযোগী হোন। তাপস তিনবার সাধু সাধু বলে তাদের কথার সম্মতি প্রকাশ করলেন। শিশু দুটিকে গো-পালকদের হাতে তুলে দিতে পেরে তাপস হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। তিনি নিজেকে হালকা বলে মনে করলেন এবং নিজেকে স্বাধীন বলেও মনে করলেন। কারণ যতদিন শিশুরা তার কাছে ছিল ততদিন শিশুদ্বয়কে দেখাশুনা করতে গিয়ে ভালো করে ধ্যান-সমাধি ও করতে পারেননি। কিন্তু এবার স্বাধীনভাবে ধ্যান-সমাধি করতে পারবেন, তাই তাপসের মনে এক শিহরণ অনুভূত হল।

পরদিন গো-পালকেরা তাপসের কুটির থেকে তাদের গ্রাম পর্যন্ত উঁচু-নিচু রাস্তা সমান করল। রাস্তার দুই পাশে মঙ্গলঘট বসাল। ধর্মধ্বজা (পতাকা) রাস্তার দুপাশে সাজিয়ে দিল। রাস্তার দুপাশে নানা রং-বেরং এর ফুল ছিটিয়ে দিল এবং পুরো গ্রামবাসী মহাউৎসব সমারোহে ডাকঢোল বাজাতে বাজাতে তাপসের কুটিরে আসল। তারা কুটিরে পৌঁছালে তাপস শিশুদুটিকে কোলে নিয়ে গো-পালক গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দিলেন। তিনি শিশুদ্বয়কে যখন গ্রামবাসীর হাতে তুলে দিচ্ছিলেন তখন তাপসের চোখের কোণে কয়েক ফোটা জল চলে আসল। এই মায়ার বাঁধন ছিন্ন করা যে বড় কঠিন। একবার মায়ায় পরে গেলে সে মায়ার বাঁধন নিধন করা বড়ই কষ্টকর। কিন্তু কি আর করার তিনি যে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। তাকে যে কান্না মানায় না, তার অন্তরে মায়ার বাঁধন ধরে রাখা যে মানায় না, মায়ার বাঁধনকে জয় করার জন্যই তো তিনি– সন্ন্যাসী হয়েছেন। তাপস এইভাবে চিন্তা করার পর জোড়ে নিঃশ্বাস টেনে নিলেন এবং ছাড়লেন।

তাপস নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দেয়ার পর গো-পালকদের উদ্দেশ্যে এরূপ উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। শিশু দুটি মহাপুণ্যবান নিজের তথা আপন পুত্র-কন্যা জ্ঞানে তাদের শিক্ষাদান করবে (প্রদান করবে), দয়া-মায়ার বাঁধনে আবদ্ধিত হয়ে তাদেরকে বড় করবে, বড় হয়ে যৌবনে পদার্পণ করলে তাদেরকে অন্যের ছেলের সাথে বিয়ে না দিয়ে এবং অন্য কোন কুলকন্যা না এনে তাদের দুজনকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করাবে। তোমাদের তো গৌ'র অভাব নেই (গোয়ালভরা গরু আছে সেটা বুঝানো হচ্ছে) কয়েকটি বলিষ্ট গরু রাজাকে উপহার দিয়ে তাদের জন্য জায়গা-জমি চেয়ে নিবে। কুমারকে রাজপদ দিয়ে অভিসিক্ত করাবে।

তাপস গো-পালকদেরকে এরূপ উপদেশ প্রদান করে শিশু দুটি তাদের হাতে তুলে

দিলেন। গো-পালকগণ শিশু দুটি কোলে নিয়ে ঢাক-ঢোল, বাদ্য-বাজনাসহকারে, তাদের পাড়ায় নিয়ে এলেন এবং যত্নসকারে লালন পালন করতে লাগলেন। লিচ্ছবি শিশু দুটি যখন বড় হতে শুরু করল তাদের আচরণ অন্য শিশুদের থেকে ভিন্ন হতে লাগল। তারা যতই বড় হচ্ছিল তত দুষ্টুমিতে ভরপুর হতে লাগল। তাদের বয়স যখন খেলা করার বয়সে পদার্পণ করেছে তখন তাদের আচরণ হয় নাগ-নাগিনের মত। সামান্য কিছুতেই তারা রেগে গিয়ে ফসফস করত, আর তারা যখন রেগে যেত তখন, প্রতিপক্ষকে থাপ্পড়, কিল, ঘুষি, লাঠি না-মারা পর্যন্ত শান্ত হত না। এক কথায় তাদের গায়ে হাত লাগাতেই হবে তবেই তাদের শান্তি। সেসময় গো-পালক শিশুদের সাথে লিচ্ছবি সে শিশু দুটিও একসাথে মেলামেশা, উঠাবসা এবং খেলাধুলা করত। এই খেলাধুলা এবং মেলা-মেশার সময় একটু ব্যতিক্রম হতে পারত না, তর্ক বিতর্ক হতে পারত না, যদি তাদের আচরণ, খেলাধুলা, কথাবার্তায় ভুল হতো অন্য শিশুরা কিছুই বলতে পারত না, বললে-লাঠি, কিল, ঘুষি, থাপ্পড় খেত লিচ্ছবি শিশু দুটি থেকে। আর লিচ্ছবি শিশু দুটি ব্যতিত অন্য শিশুরা ভুল করলে কোন কথায় নেই সাথে সাথে মাইর চলত। এভাবে প্রতিনিয়ত দুইপক্ষ শিশুদের মধ্যে ঝগড়া হত। গো-পালক শিশুরা লিচ্ছবি শিশু দুটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করত তাদের মাতা-পিতার কাছে কিন্তু এই ব্যাপারে কেউ কিছু বলতে পারত না। কারণ তারা তাপসকে কথা দিয়েছে- যত্নের কোন ত্রুটি না রেখে বড় করবে বলে। তাপসকে কথা দিয়েছে বলে লিচ্ছবি শিশুদের গায়ে কেউ একটা আঁচড়ও দিতে পারত না। একদিন লিচ্ছবি শিশুরা ও গো-পালক শিশুরা মিলে খেলা করছিল। শুরুতে খেলাটি খুব জমে গিয়েছিল। কিন্তু মাঝখানে এসে তোড়গোল শুরু হল। খেলার মাঝে এক শিশু একটি কাজে ভুল করে বসে, ঐ ছোট্টকালে আমরা যে খেলাগুলো খেলতাম রাজাপ্রজা খেলা সেরকম তারাও খেলছিল আরকি। দোষ না থাকা সত্ত্বেও আমরা যেমন দোষী বানিয়ে রাজার কাছে নিয়ে যেতাম, তারপর শিশু রাজা আমাদের শাস্তি দিতেন। সেরকম তারাও একদিন রাজা এবং চোর খেলা করছিল। তখন এক শিশুকে মিথ্যাচোর বানিয়ে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। ঐ রাজা (শিশুরাজা) সত্যি সত্যি ঐ চোর শিশুকে মারল। এতে ঐ শিশুটিসহ অন্যান্য গো-পালক শিশুরা সবাই বাড়িতে চলে গেল। তারা বাড়িতে গিয়ে লিচ্ছবি দুটি শিশুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল।

তখন মাতা-পিতারা বললেন লিচ্ছবি শিশুরা অন্য শিশুদেরকে মারে, কষ্ট দেয়, ঝগড়া করে, তাই তাদের সাথে খেলাধুলা করবে না, মেশা যাবে না। তাদেরকে এড়িয়ে চলবে, তাদের সাথে খেলাধুলা-মেলামেশা করা থেকে বিরত থাকবে। তারপর থেকে প্রত্যেক শিশু লিচ্ছবি শিশুদেরকে বর্জন করল, কেউ তাদের সঙ্গী হল না। তারা বর্জীতব্য শিশু বলে নাম ধারণ করল। এ বর্জীতব্য, বর্জীতব্য, নাম থেকে বজ্জী বা বৃজি নামটির উৎপত্তি ঘটে। তখন থেকে তারা বজ্জি বা বৃজি বলে পরিচিতি লাভ করল। এ লিচ্ছবি

বা বজ্জি শিশুরা যে জায়গাটিতে অবস্থান করত সে জায়গাটির আয়তন নাকি একশত যোজন। (১ যোজন= প্রায় ৮ মাইল (১২.৮৭ কিলোমিটার) ১ যোজন সমান যদি ৮ মাইল হয় তাহলে ১০০ (একশত) যোজন সমান প্রায় ৮০০ (আটশত মাইল) বা (১,২৮৭ বর্গ কিলোমিটার) সেই শিশুদের জায়গাটির আয়তন আটশত মাইল (১,২৮৭ বর্গ কিলোমিটার) তাপসের আদেশ অনুসারে গো-পালকেরা তাদের থেকে কয়েকটি বলিষ্ট গরু রাজাকে উপহার দিয়ে সেই একশত যোজন জায়গাটি ক্রয় করে নিল। তারপর সেখানে নগর নির্মাণ করাল। নগরটি এতই মনোমুগ্ধকর হয়েছিল যে, দূর থেকে দেখলে মনে হতো যেন, বিশ্বকর্মা নির্মিত স্বর্গীয় লীলানিকেতন সুরম্য দেববিমান। কারণ গো-পালকেরা বিবিধ কারুখচিত পট্টি (কারুকার্য নির্মিত পাতা) দিয়ে ভেতরে-বাইরে সাজগোজের কোন ত্রুটি রাখেননি। সেই খারুখচিত পট্টিতে সকাল এবং বিকেল বেলায় যখন সূর্যের মিষ্টি মিষ্টি রশ্মি পরত তখন ঝিকিমিকি করে জ্বলমল করত। সেই লিচ্ছবি শিশুরা ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করল। লিচ্ছবি কুমার যখন ষোলো (১৬) বছরে পদার্পণ করল তখন তাপসের উপদেশনানুসারে কুমারকে গো-পালকেরা রাজপদে অভিষিক্ত করাল। তারপর তারা তাপসের আদেশানুসারে অন্য জায়গা থেকে অন্য কোন কূলকন্যা না এনে এবং লিচ্ছবি কন্যাকেও অন্যকোন জায়গায় বিবাহ না দিয়ে তাদের দুই ভাইবোনকে গো-পালকেরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিল। গো-পালকেরা লিচ্ছবি কুমার ও লিচ্ছবি কন্যা এ দুই ভাই-বোনকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার পর একটি আইন জারি করল। তাদের আইনটি হচ্ছে- আজ থেকে আমরা এই নগর থেকে অন্যকোন জায়গায় আমাদের কন্যাগণকে বিবাহ দেব না এবং অন্যকোন নগর বা গ্রাম থেকে ও কন্যা এনে আমাদের পুত্রদের সাথে বিবাহ দেব না (করাব না)।

এই সামাজিক সংক্রান্ত বিবাহ কর্মটি শুধু এ নগরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এভাবে বহুদিন অতিবাহিত হতে হতে নব অভিষিক্ত লিচ্ছবিরাজ ও লিচ্ছবি রাণীর মিলনের ফলে একসাথে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে সন্তান জন্ম হয়। এভাবে তাদের ঔরসে দুটি করে ষোলোবার যমজ সন্তান জন্ম হয়। তারা হলেন বত্রিশ জন (৩২) সন্তানের জনক- জননী, অর্থাৎ তারা হলেন- ১৬ জন পুত্র ও ১৬ জন কন্যা সন্তানের মাতা-পিতা। এভাবে ক্রমান্বয়ে লিচ্ছবিরাজ এর পুত্র ও কন্যা-সন্তানেরা যুবক-যুবতীর বয়সে পদার্পণ করলে লিচ্ছবিরাজ, আজ্ঞানুসারে তার সন্তানদেরকে অর্থাৎ বত্রিশ (৩২) জন ভাই-বোনদেরকে) একে অপরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে লিচ্ছবি রাজ্যে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। এর ফলে লিচ্ছবি রাজ্যের মধ্যে জায়গার অভাব দেখা দিলে বারাণসীর রাজার কাছ থেকে জমি চেয়ে নিয়ে রাজ্যের সীমানা বাড়াতে হয়। এভাবে কেটে যায় বহুবছর। এরপর আবার জনসংখ্যা বেড়ে গিয়ে রাজ্যের জায়গার অভাব দেখা দিলে তারা রাজ্যের সীমানা

বাড়িয়ে নেয়। ক্রমান্বয়ে তাদের জায়গা বাড়াতে বাড়াতে রাজ্যের সীমানার আয়তন বিশাল আকারে ধারণ করে। এভাবে রাজ্যের সীমানার আয়তন বিশাল আকার ধারণ করেছে বলে, 'বিশাল' থেকে বৈশালী নামের উৎপত্তি ঘটে (উৎপত্তি হয়।) তারপর সেখান থেকে নগরটির নাম দেওয়া হয় বৈশালীনগর। বাল্মীকির রামায়ণ গ্রন্থে- বালকাণ্ড পর্বঃ পৃ. ৩৫ বিশ্বামিত্র, (রামকে বলেছেন- মহাভারতে একজন রাজা ছিলেন যার নাম ছিল বিশাল। এই বিশাল রাজার নাম থেকে নাকি বৈশালীর নামটি এসেছে। কিন্তু আমি "রাজশেখর বসু" অনুবাদকৃত, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত "মহাভারত" গ্রন্থটি তন্ন তন্ন করে পড়েছি, রাজা বিশাল, এরকম নামটি আমি কোথাও পাইনি।

ঐ বৈশালীনগরের লিচ্ছবিগণ তথা বজ্জিদের যৌথ কর্মের প্রতি খুবই আগ্রহের প্রবণতা ছিল। যার কাজ সে করবে, যার সমস্যা সে সমাধান করবে এ কথাটি তাঁরা বলতেন না। যে কারোর কোন সমস্যা দেখা দিলে এবং কেউ কোন কাজ করতে চাইলে তারা সকলে সম্মিলিত হয়ে সমস্যার সমাধান করতেন এবং কাজগুলো করে দিতেন। এভাবে তারা কাজগুলো করতে করতে একসময় বংশ-পরম্পরার রীতি-নিয়মে পরিণত হয়। তাদের একতার কারণে, যৌথবদ্ধতার জন্য তাদের বংশে দ্রুতভাবে উন্নতি ঘটে। (পরমখজ্যোতিকা অট্ঠকথা) এবং (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা পালি ও বাংলা দুটোই)

ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ মহামঙ্গল সূত্রে ৪ (চার) নাম্বার গাথায় দেবপুত্রকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন- 'বাহুসচ্চঞ্চ সিপ্পঞ্চ, বিনযো চ সুসিকিখতো, সুভাসিতা চ যা বাচা, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

নানা শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করা, বিবিধ শিল্প শিক্ষা করা, বিনয়ী ও সুশিক্ষিত হওয়া এবং শুভাষণ (সুবাক্য) করা, (মিথ্যাবিহীন কথা বলা), এটাই উত্তম মঙ্গল। হে-দেবপুত্র, যারা এই নিয়মগুলো প্রতিপালন করে তাদের উন্নতি ছাড়া অবনতি হয় না, এর ফলে সর্বদা মঙ্গলই হয় অমঙ্গল হয় না।

বি.দ্র. লিচ্ছবি দুই শিশু অত্যন্ত চঞ্চল পরায়ণ ছিল, তারা কাউকে মান্যগণ্য করত না। তারা এতই ক্রোধসম্পন্ন ছিল যে, অতি ক্রোধের কারণে তাদের ভালো-মন্দ বিবেচনার বোধটুকু পর্যন্ত ছিল না। তাদের এই স্বভাব ছোট্ট কাল থেকে কোন পরিবর্তনের দেখা গেল না। তাই তারা যখন খেলাধুলার বয়সী হল তখন গো-পালক শিশুদের সাথে মেলা-মেশা করতে আরম্ভ করল। গো-পালক শিশুদের সাথে মিশতে গিয়ে সামান্য কোন ভুল হলেও লিচ্ছবি দুই শিশু তাদের না মেরে শান্তি পেত না। মারতেই হবে- এতে গো-পালক শিশুরা মার খেয়ে কেঁদে কেঁদে বাড়িতে যেত। কেন কান্না করছ? মা-বাবারা এরূপ জিজ্ঞেস করলে তারা লিচ্ছবি দুই শিশুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করত। এভাবে শিশুদের মধ্যে প্রায় সময় ঝগড়া হত এবং গো-পালক শিশুরা বাড়িতে মিনে করেনি। কিন্তু পরে যখন কয়েক মাস এই সমস্যা অতিবাহিত হল তখনই তাদের মনে ধাক্কা লাগল। কেননা লিচ্ছবি দুই শিশু দিনদিন তাদের শিশুদেরকে যে, বেশি বেশি আঘাত করছে।

পর্যায়ক্রমে বৈশালীবাসী লিচ্ছবিগণ তথা বজ্জিরা (বৃজি) অতীতে যা হওয়ার হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও যা হওয়ার হবে এই মনোভাব তৈরি করে অতীত, ভবিষ্যত ভুলে গিয়ে বর্তমানকে গুরুত্ব দিতে আরম্ভ করলেন।তারা ছোট-বড় সবাই যোগ্যতা অনুসারে বিবিধ শিল্পশিক্ষা করা আরম্ভ করলেন। কেউ ব্যবসায় মন দিলেন, কেউ কৃষি উৎপাদনে মন দিলেন, আবার কেউ নৃত্যকলায় মন দিলেন, আবার কেউ যুদ্ধবিদ্যা, ধনুবিদ্যা, অশ্ববিদ্যায়-পারদর্শী হতে মন দিলেন। বৈশালীনগর গন্ডক নদীর তীরে অবস্থিত। আবার গঙ্গানদী তাদের কাছাকাছি হওয়ায়- গণ্ডক নদী দিয়ে গঙ্গা নদীতে পাড়ি দিতে পারতেন বলে বৈশালীবাসী ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিবিধ অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্রে উন্নতিতে, বৈশালীকে একটি সমৃদ্ধ নগর হিসেবে দাড় করালেন।
(প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত-পৃ.২০)

তাদের এই যৌথ ও সংঘবদ্ধতার কর্মের জন্য সেই বৈশালী আর আগের বৈশালী থাকল না, বিবিধ জায়গার বণিকগণ সেখানে আনা-গোনা করতে আরম্ভ করল। বৈশালীবাসীগণ বিবিধ পণ্য আমদানী ও রপ্তানি করা শুরু করলেন। তাদের সৃজনশীলতাকে উন্নয়ন কাজে লাগিয়ে বা ব্যবহার করে তারা বেশ লাভবান হলেন। তাদের প্রত্যেকের বাড়ি প্রাসাদে রূপান্তরিত করলেন। বাড়ির অঙ্গিনায় পুকুর করলেন, ফল ফুলের বাগান করলেন। সবদিক থেকে বর্ণনা করলে তাদের সেই বৈশালীনগরকে তারা একটি স্বর্গময় রাজ্যে পরিণত করলেন। তারপর বহুবছর অতিক্রম হলে জগতে বুদ্ধ আবির্ভূত হবেন বলে দেব-ব্রহ্মাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়।

তখন তাদের মনে ভয় হল যে, এভাবে চলতে থাকলে একদিন আমাদের সন্তানদের হাত-পা ভেঙে দিতে পারে, তাই তারা ঠিক করল যে, এই ব্যাপারটি নিয়ে রাজার সাথে আলোচনা করবে। একদিন তারা বারাণসী রাজার কাছে এই বিষয়ে নালিশ করল। রাজা সব বৃত্তান্ত শোনার পর গো-পালকদের গ্রাম থেকে লিচ্ছবি শিশুদের গ্রাম আলাদা করে দিলেন। তারপর তাদের দুই ভাইবোনকে বিয়ে করিয়ে রাজা একটি আদেশ জারি করলেন। লিচ্ছবি গ্রামের কূলকন্যা অন্য গ্রামে বিয়ে দিতে পারবে না এবং অন্য কোন গ্রাম থেকে ও লিচ্ছবি ছেলেদের জন্য কোন কূলকন্যা আনতে পারবে না। বিবাহ সংক্রান্ত এবং নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ড শুধু লিচ্ছবিরাই 'সম্পৃক্ত থাকবে। বাইরের অন্যকোন গ্রামের সাথে কোন সম্পৃক্ত থাকতে পারবে না। নব-অভিষিক্ত লিচ্ছবিরাজ ও তা শিরোধার্য করে মেনে নিলেন। সেই থেকে বিবাহকার্যটি তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। বাল্মীকির রামায়ণ গ্রন্থে- বালকাণ্ড পর্বঃ পৃ. ৩৫ বিশ্বামিত্র, (রামকে বলেছেন-মহাভারতে একজন রাজা ছিলেন যার নাম ছিল বিশাল। এই বিশাল রাজার নাম থেকে নাকি বৈশালীর নামটি এসেছে। কিন্তু আমি "রাজশেখর বসু" অনুবাদকৃত, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত "মহাভারত" গ্রন্থটি তন্ন তন্ন করে পড়েছি, রাজা বিশাল, এরকম নামটি আমি কোথাও পাইনি।

বৈশালির রাজ উদ্যানে রহস্যময় এক কন্যা শিশু

বহুবছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর জগতে আবির্ভূত হলেন- সূর্যরূপী সিদ্ধার্থ গৌতম সম্যক সম্বুদ্ধ। বুদ্ধগণ জগতে আবির্ভূত না হলে দেবমানবগণ এক অন্ধকারময় জগতে বিচরণ করেন বা বসবাস করেন। কোন এক বুদ্ধ-জগতে আবির্ভূত হয়ে তিনি যে নৈতিক শাসন রেখে যান, সেই নৈতিক-শাসনটি হাজারও বছর পর বিলুপ্ত হতে শুরু করে। বিলুপ্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে যে বুদ্ধ পরিনির্বাণ যাওয়ার পর থেকে অসংখ্য ধর্মীয় মতবাদ সৃষ্টি হয়, এর ফলে মানুষ বিভ্রান্তিতে পরে বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষা সঠিকভাবে আচরণ করতে পারে না তাই ফলও সঠিকভাবে লাভ করতে পারে না, ফল লাভ করে না বলে বুদ্ধ ধর্মের প্রতি মানুষেরা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। আত্মবিশ্বাসের অভাবে বুদ্ধের ধর্ম আচরণ করে না বলে অনন্ত অসীম গুণনীয় বুদ্ধের নৈর্বাণিক ধর্ম বিলুপ্ত হয়। মানুষ ধর্মের সহজ সরল পন্থা অবলম্বন করতে গিয়ে সারতত্ত্ব বুদ্ধের নৈর্বাণিক ধর্ম ভুলে যায়। বুদ্ধের শাসনটি যেদিন পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায় সেদিন থেকে আরেকটি বুদ্ধ আর্বিভূত না হওয়া পর্যন্ত এর মাঝে যে, একটি বিশাল সময় প্রবাহিত হয় ঐ সময়ে মানুষ ঘোরতর মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন হয়। মানব থেকে দেবগণও মিথ্যাদৃষ্টি শিখে নেয়, ফলে তারাও মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন হয়। এই দেব-মানব যে সময়ে মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে বিচরণ করে সে সময়ে গভীর দয়া-মায়া বলতে কিছুই থাকে না। বুদ্ধগণ জন্মগ্রহণ করে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার আলো জ্বালানোর পর থেকেই আবার মৈত্রীর তেজের প্রভাবে দেব-মানবগণ গভীর দয়া মায়ার আলোয়-আলোকিত হতে শুরু করেন। এজন্যে বুদ্ধকে সূর্যের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। ভগবান গৌতম সম্যক সম্বুদ্ধ ও আবির্ভূত হয়ে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। ভিক্ষু ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকাদেরসহ এবং দেব-ব্রহ্মাদের কাছে, যে ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তিমে কল্যাণ এই ধর্ম প্রচার করাকালীন সময়ে, ভাবী আম্রপালি ও তাবতিংস স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে জন্ম নিলেন সুবিখ্যাত সু-নামধন্য বৈশালীর রাজ-উদ্যানে, সবুজ পত্রেভরা বিশাল একটি আমগাছের শাখান্তরে ঔপপাতিকরূপে। বড়ই অদ্ভুত তো! মানব গর্ভে নয়, তির্যক কূলেও নয়, দেব ব্রহ্মালোকেও নয়, একটি আম্রকুঞ্জে (আমগাছের কোলে) জন্ম। তাও আবার মানব কন্যারূপে। এটি কিভাবে সম্ভব? হ্যাঁ সবই যে সম্ভব। সবই যে কর্ম আর প্রার্থনার ফল। অতীতে তিনি কাশ্যপ সম্যক সম্বুদ্ধের সময়ে ভিক্ষুণী ধর্মে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি ভাবী আম্রপালি কঠোরভাবে অশুচি ভাবনা করেছিলেন। এই অশুচি ভাবনা করার সময়ে, গর্ভবাস যে দুঃখময় ও নরকতুল্য এই সংবেগটি আম্রপালির চিত্তে উৎপন্ন হয়। তখন তিনি মনে মনে অধিষ্ঠান করেছিলেন আমি অতীত এবং বর্তমানে দান, শীল, ভাবনা ও শীল, সমাধি, প্রজ্ঞার মাধ্যমে যে পুণ্য সঞ্চয় করেছি এবং বর্তমানে যে অশুচি ভাবনা

করে যে বিরাগময়তা লাভ করেছি সকল পুণ্য সংস্কারের প্রভাবে ভবিষ্যতে বা পরবর্তী জন্মে আমার যেন অশুচিপূর্ণ গর্ভে জন্ম না হয়।

আহা পুণ্যবান ও শীলবানদের প্রার্থনা বৃথা যায় না। ভাবী আম্রপালি যেমনই প্রার্থনা করেছিলেন তেমনই ফল হয়েছে। তিনি কাশ্যপ সম্যক সম্বুদ্ধের শাসন থেকে চ্যুত হয়ে 'তাবতিংস' স্বর্গে জন্ম নিলেন। এবং সেখান থেকে চ্যুত হয়ে নরকতুল্য গর্ভবাসে জন্ম না নিয়ে ঔপপাতিকভাবে জন্ম নিলেন একটি আমগাছের কোলে। তিনি স্বর্গীয় দেব-দেবীগণের যে ঔপাপাতিক জন্মটি প্রার্থনা করেছিলন সে প্রার্থনাটি শেষ জন্মে পূর্ণ হয়েছে। এটিই তার শেষ জন্ম, তিনি আর জন্ম নেবেন না, এই জন্মে অরহত হয়ে নির্বাণ লাভ করবেন। কথিত আছে ভোরবেলাটি নাকি পবিত্র সময়। এ সময়টি শান্ত, দান্ত-সুমিষ্ট বাতাসে পরিপূর্ণ থাকে। সারারাত ঘুমের মধ্যে কেটে যায় তাই মনটি কলুষহীন হয়ে থাকে। তাই পুণ্যবান সত্তগণ এই ভোরবেলাকে বেঁচে নেন জন্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং পরিনির্বাপিত হওয়ার বেলায়ও।

আম্রপালি ও রাত্রীর শেষ প্রহরে ভোরবেলাতেই জন্ম নিলেন, জন্ম নিয়ে এঁয়া এঁয়া করে কান্না করছেন। এদিকে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। ফল ফুলের সুবাস প্রবাহিত হচ্ছে। পশু-পাখি জেগেছে, তারা কেউ নাচ করছে, আবার কেউ গান করছে। আম্রপালি যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন সেটা হচ্ছে রাজ-উদ্যান। জায়গাটি বিচরণের, রাজার পায়চারি করার প্রিয় একটি বাগান। রাজার প্রিয় বাগানটিকে দেখাশুনা করতেন একজন উদ্যান পালক। তিনি সকালবেলায় এসে ফল-ফুল গাছের গোড়ায় পানি দিতেন।

টীকা:
ভোরবেলাতে আনন্দ ভান্তের অর্হত্ব লাভ এবং ভোরবেলাতে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভ।
পাদটীকা: সূত্রপিটক খুদ্দক নিকায়ে জাতক ১ম খণ্ড: মহাস্বপ্ন-জাতকে-১০ নাম্বার স্বপ্ন ব্যাখ্যায় কৌশলরাজকে বুদ্ধ এরূপ বলেছেন- মহারাজ সুদূর ভবিষ্যতে -জগতে মনুষ্যগণ যখন অধর্মতা আচরণ করবেন তখন মনুষ্য থেকে পুণ্যফল লাভকারী দেবতারাও অধর্মপরায়ণ হবেন। যথা–গৃহদেবতা, বৃক্ষদেবতা, আকাশ-অনন্ত দেব-দেবীগণ ধর্মহীনভাবে বিচরণ করবেন। তখন রাজাদের অধার্মিকতার (যিনি দেশ, গ্রাম, নগর-শহর পরিচালনা করেন তাদের সবাইকে রাজা বোঝানো হচ্ছে।) অকুশল হেতু "আকাশে স্থিত দেবগণের বিমানকে ধাক্কা দিয়ে প্রকম্পিত করবে। তখন দেবতাদের বিমান কেঁপে ওঠায় (দৌলা) দেবতারা মনুষ্যর প্রতি দয়ামায়া ত্যাগ করে কুপিত (রাগ করবেন) হবেন, তারপর তারা (দেবতারা) বারিবর্ষণে বাধা দিবেন।

গাছের আশেপাশে জন্মানো ছোট ছোট গাছ বা লতা-পাতাগুলো পরিষ্কার করতেন। গাছের গোড়ায় মাটি, গোবর দেওয়ার প্রয়োজন হলে তা এনে তিনি ছড়িয়ে দিতেন গাছের চার পাশে। যখন যা করার প্রয়োজন হতো তখন তিনি তা করতেন এবং কাজ শেষ হলে চলে যেতেন। সেদিনও সকাল বেলায় উদ্যান পালক বাগানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি আপনমনে গাছের গোড়ায় জল বা পানি দিচ্ছিলেন। যখন উদ্যানপালক আপনমনে নীরবে গাছের গোড়ায় জল দিচ্ছিলেন তখন তার নীরবতাকে ভেঙে দিয়ে তার কানে ভেসে উঠল এক শিশুর কান্নার আওয়াজ (শব্দ)। প্রথম কান্নার শব্দটি তিনি খেয়াল করলেন না, তিনি ভাবলেন পাখির বা অন্যকোন শব্দ। আবার দ্বিতীয়বার যখন কান্নার শব্দ শুনলেন তখন একটু থমকে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কে ওখানে? কে ওখানে? কে ওখানে? এভাবে তিনি তিনবার শব্দ করলেন। বাগান নিস্তব্দ! কারোর কোন সাড়া নেই। উদ্যানপালকের মনে তখন সংশয় দেখা দিল। এত্ত সকালবেলায় এখানে কে আসল? এত্ত সকালবেলায় বাগানে শিশু কেন? তিনি এই চিন্তাগুলো করতে করতে, যেদিক থেকে শিশুর কান্নার শব্দ ভেসে আসছে, আসতে আসতে, পা টিপে টিপে, সেদিকে যেতে লাগলেন। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর একটি বড় আমগাছের কাছাকাছি যেতেই তিনি আচমকা চমকে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। একি! এতো শুধু একটি কন্যা শিশু। শিশুকে দেখে উদ্যান পালক দেরি না করে তার গায়ে থাকা বা কাঁধে রাখা গামছাটি দিয়ে বুকে জড়িয়ে নিলেন। তারপর কন্যা শিশুটির মাকে আশেপাশে খুঁজে দেখলেন। তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। গভীর এক নিঃশ্বাস ছেড়ে দিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন। না জানি কোন হতভাগিনী তার পাপের ফল এখানে রেখে গেছে। তার কি একটুও দয়া-মায়া নেই? এই নিষ্পাপ শিশুকে এখানে অসহায় ভাবে রেখে যেতে পারল?

শিশুটিকে পাওয়ার পর থেকে তার মাথায় কতো দুঃশ্চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে ঠিক নেই। দুঃশ্চিন্তা হওয়ারই কথা। কোন মায়ের বুকে এক টুকরোখানি মায়া না থাকলে মিষ্টিমাখা মুখখানি এরকম একটি শিশুকে রেখে যাওয়া অসম্ভব কিছুই নয়। তিনি এই চিন্তাগুলো করতে করতে তার চোখে পড়ল বড় আমগাছটির দিকে। তিনি এতক্ষণ নানা দুর্ভাবনায় ডুবে গিয়ে সেদিকে খেয়াল-করতে পারেননি।

বৃষ্টি বা ঝড় হলেও এক সঙ্গে পুরো রাজ্য জুড়ে হবে না। এদিকে হলে ঐদিকে হবে না, আবার ঐদিকে হলে এদিকে হবে না, (যথাঃ চট্টগ্রামে বৃষ্টি হলে পুরো চট্টগ্রামে বৃষ্টি না হয়ে নির্দিষ্ট যেকোন একটি জেলায় বৃষ্টি হবে সেরকমই বুঝতে হবে। তখন চাষবাষের ক্ষেত্রে প্রচুর অসুবিধা দেখা দিবে। একদিকে অতি বৃষ্টিতে ফসল তলিয়ে যাবে। আর অন্যদিকে অনাবৃষ্টিতে খড়া দেখা দিবে। এই অকুশল হেতু ফলই মানবগণকে এভাবে দুঃখ দিবে।

কিন্তু এখন সেদিকে চোখ পরতেই খুবই বিস্মিত হলেন। উদ্যান পালক এত বছর সেই বাগানে কাজ করছেন বা করে আসছেন তার জানা ছিল না যে, সেই বাগানে এত সুন্দর বড় একটি আমগাছ আছে। তিনি লক্ষ্য করলেন বাগানের অন্যান্য গাছগুলোর তুলনায় সেই গাছটিই বেশি সুন্দর এবং বড়। আয়তনে বিশাল এই আমগাছটির পাতাও চির-সবুজ। একটি পাতাও লালচে ভাব নেই। কি অবাক কাণ্ড! তিনি কিছুক্ষণ আত্মহারা হয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন গাছের দিকে।

সেদিন উদ্যান পালকের আর কোন কাজ হলো না, তিনি শিশুটিকে কোলে নিয়ে বাড়িতে চলে গেলেন। উদ্যান পালক বাড়িতে যেতেই তার স্ত্রী শিশুটিতে তার কোলে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- একে কোথায় পেয়েছেন? উদ্যান পালক স্ত্রীকে সব-ঘটনা খুলে বললেন। ঘটনাটি শুনে তার স্ত্রী অনেক খুশি হলেন এবং জিজ্ঞেসা করলেন– রাজাকে খবরটি জানানো হয়েছে কিনা। উদ্যান পালক বললেন না, জানানো হয়নি। আপনি কি আমাদের রাজ্যের আইন ভুলে গেছেন? এই কথা বলে স্ত্রী-শিশুসহ স্বামীকে পাঠালেন রাজার কাছে। উদ্যানপালকও শিশুটিকে কোলে নিয়ে দৌড় দিলেন রাজপ্রাসাদের দিকে। তখন রাজা রাজসভায় বসে রাজকার্য সম্পাদন করছিলেন। আদেশ, উপদেশ ও দিক নির্দেশনা এরকম কর্মই হচ্ছে রাজকার্য। বেশ কিছুক্ষণ পর উদ্যান পালক রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। উদ্যানপালককে দেখে রাজা জিজ্ঞেসা করলেন বাবা আপনি আজ হঠাৎ রাজসভায় আসলেন যে? কোন সমস্যা হয়েছে কী? রাজার এরূপ প্রশ্নে উদ্যান পালক- ভদ্র, নম্র ও শান্তভাবে বললেন- রাজন একটি ঘটনা হয়েছে। সেটি দুঃখের সংবাদ নাকি খুশির সংবাদ বলতে পারছি না।

আজ আমি সকালবেলায় উদ্যান পরিদর্শনে যাওয়ার পর এই কন্যা শিশুকে পেয়েছিলাম। তারপর উদ্যানপালক-সকালে যাযা ঘটনা হয়েছে সব খুলে বললেন। সব কথা শুনে রাজা বললেন বাবা কন্যা শিশুকে আমাকে দিন, আপনি নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরে যান। উদ্যান পালক কন্যাশিশুকে রাজার হাতে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। পরের দিন ছোট্ট একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন রাজা। মন্ত্রী এবং রাজসভার, সভাষদকে নিমন্ত্রণ করলেন। অনুষ্ঠানে যথাসময়ে সবাই উপস্থিত হয়ে গেলে, সেই ভিড়ের মাঝে সবার উদ্দেশ্যে রাজা একটি কথা ঘোষণা করলেন। উপস্থিত আমার বন্ধুদের মাঝে একটি প্রস্তাব রাখতে চাই। সেটি হচ্ছে- গতকাল আমার প্রিয় উদ্যান থেকে একটি ফুটফুটে কন্যা শিশুকে পাওয়া গেছে।

আমি ঠিক করেছি আজকে তার নামকরণ করব। তাকে যেহেতু আমগাছের শাখান্তরে পাওয়া গেছে তাই আমি ঠিক করলাম যে, তার নামটি আম্রপালি রাখব। আপনারা কি বলেন বা আমার সাথে একমত আছেন কিনা? তারা

সকলেই একে অপরের সাথে বলাবলি করে তারাও ঠিক করলেন যে, নামটি সুন্দর আছে এটাই রাখা যায়। তারপর তারা সকলেই একবাক্যে বললেন- রাজন আপনার কথা ঠিক আছে আমরাও সম্মতি দিলাম। আমগাছের মুল শাখায় পাওয়া গেছে বলে রাজা কন্যা শিশুটির নাম রাখলেন-আম্রপালি (অম্বপালি)। সেইদিন থেকে আম্রপালি নামে সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করলেন। আম্রপালি বিশাল রাজপ্রাসাদের মধ্যে, ভোগ-ঐশর্য, বিপুল সম্পত্তির আলিঙ্গনে বড় হতে লাগলেন। তিনি যত বড় হতে লাগলেন তার সৌন্দর্য তত বৃদ্ধি পেতে লাগল। আর নগরের সকলেই, ছোট-বড়-বয়জ্যোষ্ঠ সবাই তাকে খুব আদর, যত্ন, স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখতেন এবং খুবই পছন্দ করতেন। কিন্তু এই অবিরাম ভালোবাসা তিনি চিরজীবন ধরে রাখতে পারলেন না। অতীতে তিনি অর্হৎ ভিক্ষুণীকে নিন্দা করে যে পাপ করেছেন সে পাপের ফলটি প্রদানের কাল যে, পরিপক্ক হতে যাচ্ছে- আম্রপালি যত যৌবনে পদার্পণ করছিলেন তত লোকের ভিড়ের অভাব নেই। তার সেই সৌন্দর্যের কথা শুধু বৈশালীনগরে স্থায়িত্ব থাকল না। বৈশালী পেরিয়ে পুরো জম্বুদ্বীপে বিস্তার লাভ করল। রাজা-মন্ত্রী, সেনাপতি, প্রজা সবাই আম্রপালিকে একবার দেখার পর আর ভুলতে পারতেন না। তাদের চোখের তৃপ্তি-মিঠে না, যত দেখে তত বিস্মিত হয়। একি! এত রূপশ্রী কিভাবে হয়? ইনি দেবী নাকী পরী? এইরকম কতো দুর্ভাবনায় যে পরে যেত হিসেব নেই। এভাবে সময় পেরিয়ে যেতে যেতে একদিন বিশাল এক সমস্যা সৃষ্টি হয়। আম্রপালি এখন পূর্ণযৌবতী (যুবতী)। তার সৌন্দর্য পূর্ণিমা চন্দ্রকেও হার মানাতে শুরু করেছে। তখন রাজপুত্র, শ্রেষ্ঠী পুত্র, মন্ত্রী পুত্র, সাধারণ প্রজা পুত্রগণ দলে দলে যোগ দিতে আরম্ভ করল তাকে বিয়ের প্রস্তাবের নিবেদনে বা তাকে বিবাহ করার লক্ষ্যে। মহাসংকটে পরলেন রাজা। একজন মেয়ের এতগুলো লোকের স্ত্রী-হওয়া যে অসম্ভব। এতগুলো লোককে আম্রপালিকে দেওয়া সম্ভব নয় বলে, বলে দিলেন রাজা। কিন্তু রাজার এই প্রস্তাবকে আম্রপালিকে চাওয়া যুবকরা মানতে পারলেন না। আম্রপালিকে নিয়ে তোড়গোল বেধে যায়। শান্ত-আর মনোরম বৈশালীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে শুরু করে। পর্যায়ক্রমে আম্রপালিকে বিয়ে করতে আসা যুবকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। তারা একদল-অন্যদলকে প্রতিযোগিতার আহ্বান জানাতে লাগল। তাদের এরূপ ব্যবহার দেখে মহাচিন্তায় পরে গেলেন রাজা। ভেবে-চিন্তে কোন কুল-কিনারা না পেয়ে রাজা এক মহাসম্মেলনের আয়োজন করলেন। পরেরদিন রাজা পরিষদ, মন্ত্রী পরিষদ, শ্রেষ্ঠী পরিষদসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গগণ সকলে যথাসময়ে উপস্থিত হলেন মহাসম্মেলনে।

উপস্থিত সকল পরিষদের মাঝে সমস্যার কথা তুলে ধরলেন রাজা। রাজা বললেন- এইরকম প্রতিযোগিতা, যুদ্ধ যদি আমাদের মাঝে লেগে যায় তাহলে তো আমাদের পূর্বপুরুষগণের আইন-কানুন-নিয়ম-শৃঙ্খলা একদিনেই মাটির

সাথে মিশে যাবে। তাদের সেই পূর্বপুরুষের পরম্পরা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ ধরে রাখতে, যেন নগরের মধ্যে বিশৃঙ্খলা না হয় ও উক্ত সমস্যা থেকে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায় এর সমাধান খুঁজে বের করার জন্য সম্মেলনে যোগ দেয়া পরিষদদের আহ্বান জানান রাজা। তারপর উপস্থিত পরিষদ সকলেই একে অপরের সাথে আলোচনা করে ঠিক করলেন– যেহেতু একজন মেয়ে এতগুলো পুরুষকে বিবাহ করা সম্ভব নয়, সেহেতু আম্রপালিকে পতিতা বানিয়ে দেওয়া হোক, আমাদের সমস্যা থেকে বাঁচার এটাই একমাত্র পথ বা উপায়। এছাড়া আর কোন উপায় নেই। সকলের সম্মতিতে আর কোন উপায় না দেখে তাদের সাথে একমত হলেন রাজা।

কুশল কর্মের কীর্তি যেমন চতুর্দিকে বিঘোষিত করে, পুণ্যবান ব্যক্তকে আনন্দময় সুবাস দেয়, সেইরূপ অকুশল কর্মের কীর্তিও পাপিগণের পিছু ছাড়ে না। তাকে যে, পাপিগণকে দুঃখ দিতে হবে। যতদিন পাপির কর্ম পরিপক্ক না হয় ততদিন সুপ্ত অবস্থায় লুকিয়ে থাকে। তদ্রুপ আম্রপালিরও অতীতের কর্মটি পরিপক্ক হয়েছে, আম্রপালিকে যে ধরতে হবে। আর সময় ক্ষেপণ করা চলে না, উপযুক্ত সময় এসেছে অতীতে অর্হৎ ভিক্ষুণীকে বেশ্যা বলার পাপের ফল, এবার চৌদ্দগুষ্টিসহ এসে আম্রপালিকে ঘিরে ধরল। পালাবি কোথায় পালানোর কোন সুযোগ নেই। "অর্হৎ ভিক্ষুণীকে বেশ্যা বলা কত যে মজা এবার তুমি বুঝতে পারবে, শেষবারের মতো তোমাকে যে এটা ভোগ করে যেতেই হবে।

সেদিন আম্রপালিকে সব বিষয় অবগত করানো হলো, আম্রপালিকে রাজী করানোর জন্য আম্রপালির মাথায় হাত বুলিয়ে দেন রাজা। রাজা বলেন দেখ মা, আমার মানসম্মান, আমাদের পূর্বপুরুষের শৃঙ্খলার নীতি, আমাদের একতাবদ্ধতা এখন সব তোমার হাতে। এভাবে বুঝানোর পর অবশেষে আম্রপালি রাজী হলেন গণিকার হাল ধরতে। রাজী হচ্ছেন বটে তবে কিছু শর্ত আছে। আম্রপালি বললেন আমি রাজি হতে পারি তবে আমার কিছু ইচ্ছা পূরণ করতে হবে। রাজা বলেন হ্যাঁ মা বল তোমার কী ইচ্ছা? আমি তোমার সব ইচ্ছা পূরণ করে দেব। আম্রপালির শর্ত হচ্ছে– আমার কাছে কে আসল, কে গেল এসব তদারকি করা যাবে না। রাজপুত্র, শ্রেষ্ঠীপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, ও সাধারণ প্রজাপুত্র যেই হোক না কেন মনোরঞ্জন করতে হলে, সাথে করে অবশ্যই (৫০) পঞ্চাশ-মুদ্রা আনতে হবে। আর গ্রামের বা নগরের লোকের যাতে অসুবিধা না হয় মত করে নগর থেকে দূরে আমাকে একটি ঘর দিতে হবে। ঘর বা প্রাসাদের চতুর্পাশে রমণীয় পুকুর, ফল-ফুল গাছের বাগান থাকতে হবে। পুরো বৈশালীনগরজুড়ে আমি যেন যথা ইচ্ছা ঘোরা-ফেরা করতে পারি। আর রাস্তাঘাটে আমার যেন কোন বাধা সম্মুখীন হতে না হয়। আম্রপালির এই প্রস্তাবে রাজী হলেন রাজা। তারপর আম্রপালির শর্ত অনুসারে সবকিছু ব্যবস্থা করে দিলেন রাজা। গ্রাম থেকে দূরেও নয় আবার

কাছেও নয়, বিশাল বড় একটি আমবাগানে একটি সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করে দিলেন। প্রসাদের চারপাশে রমণীয় পুকুর, পুকুরে লাল-নীল, সাদা এই তিন ধরনের পদ্মফুল রোপণ করিয়ে দিলেন, প্রাসাদের চারপাশে রং বে-রং এর নানা জাতের ফুল গাছও রোপণ করিয়ে দিলেন।

কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে কিনা এবং কোন কার্য অসমাপ্ত আছে কিনা এসব কিছু তদারকি কোন কাজ বাকী আছে কিনা দেখা করার পর কাজ সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে গেলে কিছুদিন পর আম্রপালি সেই প্রাসাদে গিয়ে উঠলেন। অতীত কর্ম, বর্তমান জন্মে ফল হয়ে ফল দিচ্ছে। আম্রপালি গণিকার হাল ধরলেন।

"হায় ভগবান, হায়রে কর্ম, একি সর্বনেশে কাণ্ড" পূর্ব অকুশল কর্মের হেতুই কিনা এখন উচ্চ থেকে নিম্নদিকে ধাবিত করাল। আম্রপালিকে গণিকাবৃত্তি ধর্মের হাল ধরতে হলো। অতীত জন্মের বাচনিক দুষ্কর্মের ফলটি, ফল প্রদান করতে শুরু করেছে শেষ বারের মত। তিনি যখন গণিকাকর্ম শুরু করলেন তখন তাকে নর্তকী ও গায়িকা হতে হলো। এমনিতে তার শরীর বর্ণ উজ্জ্বল ছিল কিন্তু যখন পায়ে নুপুর ও নৃত্যের পোশাক পড়ে নাচ-গান করতেন তখন তার বিশাল প্রাসাদটি তার মধুরকণ্ঠ আর রূপের জ্বল-ঝলানিতে আলোড়িত করত। আম্রপালি গণিকা হওয়ার পর পুরো জম্বুদ্বীপে তার নাম, যশ, খ্যাতি ছড়িয়ে পরে বিভিন্ন জায়গায়। নানা জায়গা থেকে লোকজন তার কাছে আসতে থাকে।

তার নৃত্যদর্শন করে, রূপদর্শন ও মনোরঞ্জন করার পর পঞ্চাশটি (৫০-পঞ্চাশটি) স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে চলে যায়। এভাবে প্রতিনিয়ত লোকজনের আসা যাওয়া চলতেই থাকল। বৈশালীবাসী যুবকেরা তো আম্রপালিকে একদিন না দেখে থাকতে পারে না। প্রতিদিন সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে তারা দলেদলে আম্রপালির প্রাসাদের দিকে যেতে থাকে। সাথে নেয় প্রতি জনে ৫০ (পঞ্চাশ) মুদ্রা। আম্রপালি গণিকাধর্ম পালন করলেও তার ভোগবিলাস ও ঐশ্বর্যের অভাব ছিল না। তিনি স্বাভাবিকভাবেই জীবন-যাপন করতেন। অন্যান্য নারীর চেয়ে তাকে একটু বেশি মনোরঞ্জনীয় কর্ম করতে হতো এই হচ্ছে তার ব্যবধান, এই হচ্ছে তার পরিচয়। এই পরিচিতি যে তিনি ইচ্ছে করে লাভ করেননি। এই গণিকাবৃত্তি করার তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। সবকিছু যে, পরিস্থিতির স্বীকার।

পাদটীকা:

প্রচীন ভারতে এবং অন্যান্য জায়গায় রাজকীয় সিদ্ধান্তে যারা পতিতা হত তারা যে শুধু পতিতার কাজ করত তা কিন্তু নয়। তারা আরও মনোরঞ্জনীয় কাজও করত। যেমন- নাচ, গান, বাদ্য-বাজনা ইত্যাদি।

মগধরাজ বিম্বিসারের সাথে আম্রপালির গোপন প্রণয়

ভগবান গৌতম সম্যক সম্বুদ্ধ- বুদ্ধাংকুর অবস্থায় তুষিত সুরম্য নন্দন-কানন (তুষিত স্বর্গ) থেকে ধরাধামে (পৃথিবীতে) অবতরণ বা জন্ম নেওয়ায় মতাময়ী মাতা ধরণী (পৃথিবী) খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠে। লুম্বিনির বিশাল বড় শালবনের মাঝখানে অতিশয় রমণীয় একটি শালবৃক্ষ বা গাছের নিচে সিদ্ধার্থ জন্ম বা ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথেই পৃথিবী ভূমিকম্পের মাধ্যমে জানান দিয়েছে যে, হে মহাপুরুষ আপনার আগমনে আমার জীবনীশক্তি ফিরে এসেছে, আপনাকে আমার ক্রোড়ে বা কোলে সু-স্বাগতম। এই মহাপুরুষ আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো-জম্বুদ্বীপ হয়ে ওঠে সবুজীয় ঘেরা, শস্য - শ্যামলায় ভরপুর। পর্যায়ক্রমে বুদ্ধাংকুর সিদ্ধার্থ রাজসিংহাসন ত্যাগ করে বুদ্ধত্বতা লাভ করে ধর্মচক্র প্রবর্তন করার পর মগধের, রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন। বর্তমান বুদ্ধ শাসনে, মগধের রাজা বিম্বিসার কর্তৃক বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে দানকৃত সেই বেনুবন বিহারে। এটিই ছিল ত্রি-রত্নের উদ্দেশ্যে দান করা প্রথম বিহার। বুদ্ধ যে জায়গায় অবস্থান করতেন সেই জায়গাটি ছিল বিশাল বড় বাঁশবন। এই বাঁশবনের মাঝখানে কাঠবিড়ালিদের বিচরণের একটি স্থান ছিল। কাঠবিড়ালিদের বিচরণের স্থানটির পাশেই ছিল ভগবান বুদ্ধের মূলগন্ধ খুঁটি (ভগবান বুদ্ধ যেই রুমে ধ্যান করতেন, বিশ্রাম করতেন সেই রুমকে বলা হয় বা সেই স্থানকে বলা হয় মূলগন্ধ খুঁটি।) স্থানটি হচ্ছে মগধের রাজধানী-রাজগৃহ নগরের কিছু দূরে। স্থানটি খুবই রমণীয়। লোকজনের কোলাহলশূণ্য বিহার থেকে নগরের অনেক দূরত্ব। তবে বিহারে আসা-যাওয়া করা খুবই সহজ। মূলকথা হচ্ছে- মগধের রাজধানী, রাজগৃহ নগরের, পার্শ্ববর্তী বেলুবন বিহারে, কলন্দক নিবাপে অবস্থান করতেন বুদ্ধ। ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহের, বেলুবন, কলন্দক নিবাপে অবস্থানকরাকালীন সময়ে রাজগৃহের একজন নগরবাসী (ব্যবসায়ী) কোনো একটি বাণিজ্যিক কর্মের জন্য বৈশালীতে গমন করেছিলেন। তিনি বৈশালীতে আগমন করার পর রীতিমত অবাক না হয়ে থাকতে পারলেন না। কারণ তিনি বৈশালীনগরের মত স্বর্গীয় নগর এর আগে কোনোদিন দেখেননি। তিনি দেখলেন বিশাল বড় বৈশালীনগরের মধ্যে একই ধরনের,

---

পাদ-টীকা:

মগধের রাজধানী: পূর্বের নাম গিরীব্রজ, পরে রাজগৃহ, বর্তমান রাজগীর। বেলুবন অর্থ বাঁশবন, কলন্দক অর্থ কাঠবিড়ালী, নিবাপ অর্থ স্থান, কলন্দক নিবাপ অর্থ- কাঠবিড়ালিদের বিচরণের স্থান। ভগবান বুদ্ধ ঐ রমণীয় স্থানেই অবস্থান করতেন। (সংযুক্ত নিকায় ৬ষ্ঠ নিপাত)

একই কারুকার্য খচিত, একই সমান, একই আয়তনের, একই জায়গা বরাবর, ৭৭০৭ (সাত হাজার সাতশত সাতটি) রমণীয় প্রাসাদ। এ প্রাসাদগুলো একে অপরের প্রাসাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তিনি আরও দেখলেন ৭৭০৭ টি- কুটাগারশালা, ৭৭০৭ টি রমণীয় প্রমোদ উদ্যান এবং ৭৭০৭ টি সুপেয় পুষ্করণী বা পুকুর। এগুলো প্রতিটি প্রাসাদের জন্য প্রাসাদের পাশেই তৈরি করা হয়েছে বা বানানো হয়েছে। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন ৭৭০৭ টি প্রাসাদের মালিকেরা প্রত্যেকেই নিজেদের রাজা বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করেন। তাদের এই রাজা বলে পরিচয় দেয়ার পেছনেও অবশ্যই একটি কারণ আছে। কারণটি হচ্ছে এইরকম-লিচ্ছবিগণ আদি-পূর্বপুরুষ থেকে তারা এমন একাতাবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করে এসছেন যে, বিশ্বের ইতিহাসে তারাই একমাত্র গণতন্ত্র সৃষ্টিকারী ছিলেন। তারা বা লিচ্ছবিরা শুধু গণতন্ত্র সৃষ্টি করেননি তারা বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছেন গণতন্ত্র, একতাবদ্ধ, সংঘবদ্ধ, কেউ কাউকে ছোট-বড় না ভেবে, সবাই যৌথভাবে কাজ করলে উন্নতি ছাড়া অবনতি হয় না। লিচ্ছবিগণ অতীতে তো গণতান্ত্রিকতা পালন করেছেন বা যুগযুগ ধরে পালন করে এসছেন কিন্তু তাদের গণতান্ত্রিকতা আরও মজবুত ও শক্তিশালী হয় বুদ্ধের সময়কালে এসে। লিচ্ছবিগণের যৌথবদ্ধতার প্রতি প্রসন্নতা লাভ করে স্বয়ং মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ তাদের যৌথবদ্ধতার গুণকে প্রশংসারচ্ছলে সপ্ত অপরিহানিয় ধর্মদেশনা প্রদান করেছিলেন।
(মহাপরিনির্বাণ সূত্র)

লিচ্ছবিগণ কেউ কাউকে ছোট বড় না ভেবে, কেউ কাউকে নিন্দা বা তিরস্কার না করে, তারা সবাই একে অপরকে গুরুত্ব দিতেন বা গুরুত্বতা লাভ করতেন। এজন্য তারা প্রত্যেকে নিজেদেরকে রাজা বলে পরিচয় দিতেন।

রাজগৃহের সেই নগরবাসী আরেকটি ঘটনা দেখে রীতিমত চমকে না ওঠে থাকতে পারলেন না। তিনি দেখলেন আকাশের সূর্যের আলো নিভিয়ে গেলে সন্ধ্যা নামার পরপরই বৈশালীর রাজপুত্র, শ্রেষ্ঠীপুত্র বা অন্যান্য পুত্ররা দলবেঁধে কোথায় যেন যাই। তাদের চেহারায় মুখের ভাজেভাজে আনন্দের রংমশাল। সূর্যমুখী ফুলকে যেমন সূর্যের সোনালী রশ্মি টেনে নেয়, সূর্য যেদিকে সূর্যমুখী ফুলের মুখও সেদিকে ঘুরে যায়, সেইরূপ বৈশালী যুবকদেরকেও যেন কিছু একটা জাদুকরী মায়াবী সুরে ডাকছে। আয় কাছে আয়! তাদের মন পরে থাকে সবসময় গ্রাম থেকে কিছু দূরে বড় একটি প্রাসাদের দিকে। তিনি বুঝতে পারলেন এ সেই প্রাসাদই তাদের মন চুরি করেছে। রাজগৃহের নিগম বা নগরবাসীর মনে তখন আরো দ্বিগুণ কৌতূহল বেড়ে যায়। সেই প্রাসাদে কি এমন রহস্য আছে আমাকে জানতেই হবে। যার জন্য সন্ধ্যা হলেই যুবকেরা পাগলের মতো ছুটে সেইদিকে। একদিন নৈগম বা নগরবাসী তার মনের কৌতূহল ধরে রাখতে না পেরে এক যুবককে ডেকে জিজ্ঞেসা করলেন– বাবা

আমি এখানে আসার পর থেকে দেখছি সন্ধ্যা হলেই তোমরা দলবেঁধে কোথায় যেন গমন কর। আসলে তোমরা কোথায় যাও একটু খুলে বল বা বুঝিয়ে বলতো! তখন যুবকটি বললেন– এই কাজটি আমাদের নিত্যদিনের। আমাদের গ্রামের কিছু দূরে একটি প্রাসাদের মধ্যে আম্রপালি নামে এক নর্তকী অবস্থান করেন। তাকে দেখলে বুঝায় যায় না, সে মানবী নাকী দেবী, দেবী নাকী পরি, তাকে যত দেখি তত দেখতে ইচ্ছে করে। তার যেমন শরীরের সুন্দর গঠন আর তেমনি মুখাবয়ব, তেমনি তার মধুরকণ্ঠ। তার নৃত্য, নৃত্যের সুরে বাদ্যযন্ত্রের তাল, যন্ত্রের সুরের তার মধুরকণ্ঠীয় গান। তিনি যখন তালে তালে নৃত্য ও গান আরম্ভ করেন তখন যেন মনে হয় তার বিশাল প্রাসাদকে পেরিয়ে তার মধুর কণ্ঠটি স্বর্গীয় ইন্দ্রভুবনকেও কম্পিত করে। যুবকের মুখ থেকে এই প্রকারে আম্রপালির রূপের-গুণের কথা শুনে নিগমের মনটা আম্রপালি চুরি করে নিল। তারপর দিন নিগম যুবকদের সাথে যোগ দিলেন আম্রপালির রূপ, নাচ-গান দেখবেন বলে। সেদিন নিগম আম্রপালির প্রাসাদে ঢোকামাত্রই তার পুরো শরীরে ভূমিকম্পের ন্যায় শিহরণের পুলকি জেগে ওঠে। তিনি আম্রপালিকে দেখে নিজের চোখে বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, এটা কি সত্যি নাকি কল্পনা? ইনি কি মানবী? দেবী নাকি পরী? দেখতে যেমনই লম্বা শরীরের গঠন, তেমনই তার চেহারার পুলকিত মুখের হাসি। আর তেমনই মানিয়েছে সোনালী বর্ণের নর্তকীর পোশাক। এইরকম মানবী অপ্সরী দেখে কী স্থির থাকা যায়? নিগম মনেমনে কতই কি কল্পনা-জল্পনা করতে থাকে। তারপর নিগম বৈশালীতে তার যা করণীয় কর্ম ছিল সেগুলো শেষ বা সম্পন্ন করার পর এক মুহূর্তও দেরী না করে রাজগৃহে ফিরে গেলেন। তখনও রাজগৃহে গণিকাধর্ম প্রবর্তন বা প্রচলিত হয়নি। বলা বাহুল্য, সে সময় বিম্বিসার ছিলেন পরিপূর্ণ যুবক। সে জন্য তার মনেও পঞ্চকামগুণ, আনন্দ-উল্লাস পরিপূর্ণ থাকা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। বৈশালীতে আসা সেই নিগম বৈশালী থেকে নিজ জন্মভূমি রাজগৃহে ফিরে গিয়ে কারোর সাথে দেখা না করে সবার আগে বিম্বিসারের সাথে দেখা করলেন। দেখা করার পর কুশল-বিনিময় করে মগধরাজ বিম্বিসারকে বললেন- দেব, আমি বৈশালীনগর পদার্পণ করেছিলাম গত কয়েকদিন আগে। সেখানে গিয়ে দেখি বৈশালীনগরকে লিচ্ছবিগণ এত উন্নত পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যা দেখে আমি অবাক না হয়ে থাকতে পারিনি। নিগম যা যা বৈশালীনগরে দেখেছিলেন সব মগধরাজ বিম্বিসারকে শোনালেন। পরিশেষে বললেন– রাজন আমি দেখলাম বৈশালীবাসীগণ একজন গণিকা বা নর্তকী স্থাপন করেছেন। সেই নর্তকীর নাম আম্রপালি। তার উপস্থিতিতে বৈশালীবাসীগণ অধিকতর প্রসন্নপরায়ণ। যারা সে আম্রপালির প্রতি মনোরঞ্জনে আগ্রহী হন তারা পঞ্চাশটি (৫০) স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে গমন করেন। নিগম বললেন– সুতরাং রাজন আমাদের রাজ্যেও যদি নর্তকী স্থাপন করি তাহলে আমাদের রাজ্যও অধিকতর শোভা পাবে। রাজ্যবাসীও প্রসন্নতা লাভ করবেন, মনোরঞ্জনে উৎফুল্ল গ্রাহী হবেন। তখন মগধরাজ

বিম্বিসার বললেন– তাহলে আপনি সেরকমই একজন কুমারী অনুসন্ধান করুন, যিনি এ কাজে উৎসাহী, যিনি লোকের অন্তরে প্রসন্নতা আনয়নে সক্ষম। যাকে দ্বিধাহীনভাবে নর্তকীধর্মে নিয়োগ করা যায়। সেই সময় রাজগৃহে একজন কুমারী ছিলেন। দেখতে রূপে-রূপবতী, গুণে-গুণবতী, বিদ্যায়-স্বরসতী, (যিনি জ্ঞানে, কৌশলে, বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ তাকে স্বরসতী বলা হচ্ছে- কাল্পনিক দেবিকে নয়।) সবকিছু মিলিয়ে নিগম সেই কুমারীকে নর্তকীধর্মে নিয়োগ করার উপযুক্ত মনে করলেন। নাম তার শালবতী। যেমনই লম্বা তেমনই সুন্দরী। নিগম শালবতীর কাছে উপস্থিত হয়ে সবকিছু খুলে বললেন। যাক, অবশেষে শালবতী নর্তকী কাজে নিযুক্ত হতে রাজি হলেন। নিগম শালবতীকে গণিকা বা নর্তকীধর্মে নিযুক্ত করলেন। সেই থেকে রাজগৃহেও গণিকা বা নর্তকীধর্মের প্রচলন ঘটে।

কিন্তু এদিকে যে মগধরাজ বিম্বিসারের মনে শান্তি নেই। যেদিন নিগমের মুখ থেকে আম্রপালির সৌন্দর্যের কথা শুনলেন সেদিনই আম্রপালি বিম্বিসারের মন চুরি করে নিয়েছেন। তিনি খাচ্ছেন, ভাবছেন, কথা বলছেন, সবকিছু করছেন কিন্তু মন সে জায়গায় নেই। বিম্বিসারের মন আম্রপালির কাছে চলে গেছে। তিনি এভাবে আর থাকতে পারলেন না, একদিন ছদ্মবেশ ধারণ করে মগধরাজ বিম্বিসার বৈশালীতে পদার্পণ করলেন। বৈশালীনগরে রমণীয় দর্শনীয় স্থান, নানা মনোরঞ্জনীয় ফুলের বাগান, সবকিছু দেখলে স্বর্গীয় প্রমোদ-উদ্যানই মনে হয়। কিন্তু বিম্বিসারের সেগুলো উপভোগ করার সময় নেই। তার মন শুধু আম্রপালিকে খোঁজে। ছদ্মবেশধারী মগধরাজ বিম্বিসার খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে খুঁজে পেলেন আম্রপালির সেই প্রমোদ প্রাসাদ। বিম্বিসারের সেদিন আর রাজ্যে ফেরা হল না। তিনি সেদিন আম্রপালির প্রাসাদ কোলাহলশূণ্য হওয়ার অপেক্ষায় সেখানে লুকিয়ে ছিলেন। সব লোকজন চলে যাওয়ার পর বিম্বিসার আম্রাপালির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। মগধের রাজা বিম্বিসার আম্রপালিকে দেখা মাত্রই শিহরিত হলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন নিগমের কাছে যা শুনেছি তার সৌন্দর্যের বর্ণনাতো নগণ্য। কিন্তু বাস্তবে আম্রপালির সৌন্দর্যের বর্ণনা করা সত্যি দুষ্কর। তিনি আরও ভাবেন আমি জীবনে অনেক সুন্দর সুন্দর যুবতি দেখেছি কিন্তু আম্রপালির মতো রূপবতী নারীর দেখা পাইনি। তিনি মানবী নন, সাক্ষাৎ স্বর্গের অপ্সরা। আম্রপালির অপূর্ব রূপলাবণ্য, বিমোহিত চেহারা, মনোরম চক্ষু ও অঙ্গলোটনী, নানা বাহারী পোশাকাদি সবকিছু মিলিয়ে আম্রপালিকে স্বর্গীয় দেবীর ন্যায় মনে হলো রাজার কাছে। বিম্বিসার রাজা আম্রপালিকে দেখার পর আগের ছেয়ে দ্বিগুণ কামনার আগুনে দগ্ধ হলেন। এদিকে আম্রপালিও রাজার সাক্ষাৎ পাওয়ার পর থেকে তার মনটা কেন জানি আনসান আনসান করতে শুরু করেছে। কারণ বিম্বিসার রাজা যুবক বয়সে এতই রূপবান-ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন যে, বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। সবকিছু মিলিয়ে তিনিও দেবপুত্রের ন্যায় ছিলেন।

তারপর আম্রপালি এবং রাজা কুশল বিনিময় করলেন। তাদের অন্তরে জমে থাকা গোপন প্রেমের কথা একে অপরকে বিনিময় করলেন। রাজা বিম্বিসার ও

আম্রপালির মিলন ঘটল। এই মিলন যে সাধারণ নয়। এই মিলনের ফল আম্রপালিকে জীবনের দুঃখচক্র থেকে মুক্তি দেবে। তাদের এই গোপন সম্পর্ক যে, আলোর দিশা হবে তারা তা জানে না। আম্রপালির জন্য অপেক্ষা করছে বিশাল এক অতুলনীয় সুখের ভাণ্ডার। তাকে যে আর দুঃখময় অঙ্গার গর্তে পরতে হবে না। তাকে নির্বাণের হাতছানি দিচ্ছে। তিনি আহরণ করবেন সুখময় নির্বাণের অমৃত সুধা। তার জীবন হবে মুক্ত আকাশের ন্যায় স্বাধীন। তিনি হবেন চির অমর, চির অম্লান, তার অসংখ্য জীবনের দুঃখের নীলিমার দ্বীপশিখা নিভে যাবে। তিনি লাভ করবেন পরম সুখ নির্বাণ।

আম্রপালির পুত্র বিমল কৌণ্ডিণ্য সে কি তার পিতাকে খুঁজে পাবে

রাজা বিম্বসারের সাথে আম্রপালি গোপন সম্পর্কে জড়ানোর পর আম্রপালি হলেন অন্তঃসত্ত্বা। কিছুদিন গত হওয়ার পর, একদিন আম্রপালি শরীরের অস্বাভাবিক লক্ষণ অনুভব করলেন। বমি বমি ভাব, বুকে ভার ভার এবং টানটান ও কিছু অস্বাভাবিক লক্ষণের প্রকাশ পেলেন তিনি। এসব হওয়ার পর তার বুঝতে বাকী রইল না যে, তিনি হয়েছেন গর্ভবতী। মগধের অধিপতি বিম্বিসার রাজা আম্রপালির প্রাসাদে তথা বৈশালীতে কিছুদিন অবস্থান করার পর একদিন রাজগৃহে ফিরবেন বলে মনস্থির করলেন। ঠিক তখনই রাজা শুনতে পেলেন আম্রপালির গর্ভবতী হওয়ার কথা। আম্রপালির অন্তঃসত্ত্বার কথা শুনে উপহারস্বরূপ রাজার সঙ্গে সোনা-রূপা, মণি-মুক্তা ও অর্থ সম্পদ যা ছিল সবকিছু দিয়ে দিলেন। যাওয়ার আগে রাজা বললেন– প্রিয়তমা সঙ্গে করে, আমি তেমন কিছু আনিনি। এখন যা আছে উপহারস্বরূপ এগুলো রেখে দাও। আমি রাজগৃহে ফিরে যাব। পরে আমি আবার তোমার সাথে দেখা করতে আসব। আম্রপালিকে এই বলে বিম্বিসার রাজা রাজ্যে ফিরে গেলেন। কিন্তু রাজা যে গেলেন (গেছেন) দিন যায়, মাস যায়, আর ফিরে আসার কোন খবর নেই। আম্রপালি প্রহরগুণে কবে পাব তারই নয়নের দেখা। এদিকে আম্রপালির অবস্থা দিনদিন খারাপ হতে চলেছে। তিনি হলেন একাকিনী। তার মাথায় নানা দুর্ভাবনা চেপে বসল। এভাবেই আম্রপালির কেটে যায় দশমাস। দশমাস অতিবাহিত হওয়ার পর সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার দিন তারিখ ঘনিয়ে এসেছে। একদিন আম্রপালি হঠাৎ গর্ভযন্ত্রণা অনুভব করলেন। এই যন্ত্রণার ব্যথা কিন্তু যেমন-তেমন ব্যথা নয়। জীবনের সাথে পাঞ্জা লড়ার ব্যথা। তবে আম্রপালির জন্য ও তার গর্ভে থাকা সন্তানসহ উভয়ের জন্য এটাই শেষ যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা বুদ্ধের সংস্পর্শে আসলেই নিভে যাবে। একপর্যায়ে ভীষণ গর্ভযন্ত্রণা অনুভব করতে করতে একটি ফুটফুটে পুত্রসন্তান জন্ম দিলেন আম্রপালি। 'মা' যেমন অত্যন্ত রূপশ্রী, সুকোমল, সেইরূপ তার পুত্রও হলেন সুবিমল কান্তি। সু-শ্রী নবজাতক দেবপুত্রের ন্যায় উজ্জ্বল নক্ষত্রতুল্য হওয়ায় তার নাম রেখে দেওয়া হলো 'বিমল কোণ্ডঞ্ঞ'।

নবজাতক ছোট্ট শিশু অদ্ভুত এ নামকরণ মূলে রয়েছে অতীত জন্মে এক অপূর্ব কাহিনীঃ আজ থেকে ৯১ কল্প পূর্বে বিপশ্যী বুদ্ধের সময়ে বিমলকোণ্ডন্য এক ঐশ্বর্যশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তার প্রাপ্ত বয়স হলো তখন তিনি একদিন বিপশ্যী বুদ্ধকে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক উপাসিকা পরিষদ পরিবেষ্টিত হয়ে ধর্মদেশনা করতে দেখেন। বুদ্ধকে দেখে ভাবী বিমল কোণ্ডন্য অতিশয় প্রসন্ন হলেন এবং তিনি তার হাতে থাকা চারটি স্বর্ণময় পুষ্প দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করলেন।

বিপশ্যী বুদ্ধ ভাবী বিমল কোণ্ডঞ্ঞ এর মনোভাব বুঝতে পেরে তার শ্রদ্ধা ও মনের প্রসন্নতা আরও বৃদ্ধি করার জন্য এমন এক অলৌকিক ঋদ্ধি প্রদর্শন করলেন, যার ফলে সেই পুষ্পগুলো শূন্য ভেসে উঠে সমগ্র ঐ ধর্মসভাকে আলোয় আলোকিত করে তুলল। এই দৃশ্য দেখে তিনি অধিকতর প্রসন্ন হলেন। অতঃপর তিনি বুদ্ধকে বন্দনা করে ঘরে ফিরে গেলেন। ঘরে ফিরে গিয়ে কোন এক অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করলেন। ঐ সময় তারচিত্ত বুদ্ধের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন ছিল বলে সাথে সাথে তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হলেন।

'তুসিত' স্বর্গে লক্ষ বছর সুখভোগ করার পর স্বর্গের পুণ্যক্ষয় হলে তিনি শেষ জন্মে বিম্বিসার রাজার ঔরসে এবং আম্রপালির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই অতীত পুণ্যের প্রভাবেই শেষ বা অন্তিম জন্মে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়েছিল অত্যন্ত সুদর্শন ও বিমোহিত মনোহারী। অতীত জীবনের পুণ্যের প্রভাব এবং এই জীবনের বিমল কান্তি সৌন্দর্যকে ভিত্তি করে তার নাম রাখা হয় 'বিমল-কোণ্ডিন্য'। *(বুদ্ধ যুগে বৌদ্ধ নারী– পৃ.৮৬)* থেরগাথা একনিপাত, সপ্তমবর্গ অর্থকথা- ৪নং বিমল কোণ্ডিন্য তেরগাথা বর্ণনা ৬ষ্ঠ সংগায়নে অনুমোদিত পালি ত্রিপিটক অ্যাপ।

পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোনকিছুই প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেতে পারেনি, পারছে না এবং পারবে না। প্রকৃতি তার নিয়মেই চলমান। প্রকৃতির নিয়ম কারো কথা শুনে না, কারো কথা মানে না; তার মাতা-পিতা নেই। তিনি অচঞ্চল এবং তার নিয়মে তিনি স্থির। প্রকৃতির আছে- মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা। প্রকৃতির ন্যায় সময় বা কালই চলমান। তিনি কারো জন্য অপেক্ষা করেন না, আবার উপেক্ষাও করেন না। তার নিয়মে তিনি স্মৃতিময়ী ও বহমান। প্রত্যেক কিছুর ধারাবাহিকতা রয়েছে। এভাবে ক্রমান্বয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, সময় তার নিয়মে চলছে। এদিকে আম্রপালির ছোট্ট সোনামনি স্নেহের বিমলের সাথে ভালোই দিন যাচ্ছে। আম্রপালি বিমলকে বুকে জড়িয়ে মাঝে মাঝে গুণগুনিয়ে গান করেন। ছোট্ট সোনামনির সাথে হেঁসে খেলে কথা বলেন। মাঝে মাঝে পুত্রকে মধুরকণ্ঠে গান শোনান, মাঝে মধ্যে তিনি দু'একটি কবিতাও আবৃত্তি করেন।

একদিন পালঙ্কে শুয়ে আম্রপালি কোমলতার ঠোঁট দিয়ে বিমলকে চুমু খেলেন। এবং মায়াভরা চোখে বিমলকে বলতে লাগলেন–

ছোট্ট সোনামণি, চোখে তোর আলো,
হাঁসির ঝিলিক যেন দিগন্তের পালো।
নরম হাতের স্পর্শে জড়িয়ে থাকি,
তোর মিষ্টি হাসিতে যেন ভেসে যাই আমি।
ঘুমের দেশে পরী যখন ডাকে,

আমি পাহারা দিই তোর স্বপ্নের ফাঁকে।
নরম বালিশে মাথা রাখিস যবে,
আকাশের চাঁদও হেঁসে ওঠে তবে।
তোর খুনসুটিতে প্রাসাদ ভরে যায়,
কান্নার মাঝে সুখ লুখিয়ে রয়।
তুই যে আমার ভালোবাসার গান,
তোর মাঝে বেঁচে আছে আমার এই প্রাণ।
ছোট্ট পাখি ডানা মেলে একদিন,
জগৎ দেখিস আপন যতদিন।
তবুও মনে রাখিস মায়ের এই কোলে,
স্নেহের আশ্রয় থাকবে অনন্তকালে।

একসময় ভগবান বুদ্ধ বৈশালীতে গমন করেছিলেন। তখন আম্রপালির পুত্রের বয়স সাত বছর। ভগবান বুদ্ধ বৈশালীতে অবস্থান করাকালীন সময়ে আম্রপালি পুত্র বিমল কোণ্ডিণ্য একদিন নগরের ছেলেদের সাথে খেলা করছিলেন। খেলা করার সময় নগরবাসী পুত্ররা বিমলকে জিজ্ঞেস করল- বিমল তুমি কি জান তোমার পিতা কে? তোমার পিতা আর কেহই নয়, ঐ যে রাজগৃহের যিনি অধিপতি, তিনিই তোমার পিতা। তিনি হচ্ছেন– রাজা বিম্বিসার। এই কথা বিমল বিশ্বাস করলেন না। তাদের সাথে তর্কে জড়ালেন। অনেক্ষণ তর্ক করার পর নগরবাসী পুত্ররা বলল আমাদের কথা বিশ্বাস হচ্ছে নাতো-যাও, তোমার মায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেসা কর, তোমার পিতা কে? বিমল কোণ্ডণ্য নগরবাসী ছেলেদের মুখ থেকে তার পিতা রাজা বিম্বিসারের কথা শুনে মনে মনে ঠিক করল যে, তিনি তার পিতার সাথে দেখা করতে যাবে। কিন্তু পরক্ষণে আবার চিন্তা করল যে, আমি আগে আমার মায়ের কাছ থেকে জেনে নিব, নগরবাসী ছেলেদের কথা সঠিক কিনা, তিনি মনে মনে এসব বিষয় চিন্তা করার পর বিমল আর ক্ষেপণ করলেন না তিনি তৎক্ষণাৎ মায়ের কাছে গিয়ে বলল- মা নগরবাসী পুত্রদের সাথে খেলা করার সময় তারা আমাকে অবজ্ঞা করে বলেছে যে, আমার পিতা নাকি মগধের রাজা বিম্বিসার? বিমলের এই কথা শুনে আম্রপালি প্রথমে কিছু বলতে চাইলেন না। তিনি একটু লজ্জিত হলেন। কিন্তু পরে আর লুকালেন না, তিনি ব্যাপারটি বিমলকে বুঝিয়ে বললেন। আম্রপালি বিমলকে বিষয়টি অবগত করানোর পর আবার বললেন দেখ বাবা বিমল, এই সংসার জগতে বেঁচে থাকতে হলে কে কত কথা বলবে তা ঠিক নেই, তাদের কথায় কান দিলে জীবনে উন্নতি করা তো দূর, বেঁচে থাকাও কঠিন হয়ে পরে। তাই তারা কি বলছে, কি করছে এটাকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজের আত্মমর্যাদাকে

গুরুত্ব দাও। তুমি কাউকে অবজ্ঞা করো না, সে হোক ছোট কিংবা বড়, কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না। এভাবে শিক্ষামূলক উপদেশ দিয়ে আম্রপালি বিমলকে শান্ত করলেন। বিমল বুঝতে পারলেন জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে সফল হতে হলে নিজের আত্মমর্যাদাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এসব বিষয় চিন্তা করতে করতে তার পিতার সাথে যে একদিন দেখা করতে যাবেন এই বিষয়টিও ভুলে গেলেন। পিতার সাথে পরিচয় হওয়া হলো না। পিতা-পুত্রের আর দেখা হলো না। এভাবে বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন বিমল তার বন্ধুদের সাথে গল্প করছিলেন রমণীয় আমবাগানে। তখন বৈশালীবাসীগণ বুদ্ধের ধর্মদেশনা শ্রবণের জন্য দলে দলে বুদ্ধের কাছে যেতে লাগলেন। তারা বুদ্ধের গুণকীর্তন করছিলেন, প্রশংসায় হৈ হুল্লোড় শুরু করলেন। বিমল তাদের মুখ থেকে বুদ্ধের ধ্বনি শুনে তার শরীরে শিহরণ জাগ্রত হল। তিনি চলে গেলেন মায়ের কাছে। আম্রপালি তখন বেলকনিতে বসে কি যেন আনমনে ভাবছিলেন। তখন তিনি হঠাৎ পিছন থেকে মা বলে ডাক শুনতে পেলেন। তিনি ফিরে তাকাতেই দেখলেন বিমল তাকে ডাঁকছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে বাবা, ডাকছ কেন? মা আমি বন্ধুদের সাথে গল্প করার সময় দেখলাম নগরবাসীগণ দলে দলে বুদ্ধের কাছে যাচ্ছেন। বুদ্ধ নাকী আমাদের বৈশালীনগরে পদার্পণ করেছেন। নগরবাসীগণ বুদ্ধের অনেক প্রশংসা করছেন। বুদ্ধের এই প্রশংসাগীতি শুনে আমার শরীর শিহরিত হয়েছে। চল না মা, আমরাও বুদ্ধের কাছে যাই। বিমলের মুখ থেকে এসব কথা শুনে আম্রপালি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তার মনেও কেন জানি এক অদ্ভুত শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়েছে বুদ্ধের প্রতি। পরদিন আম্রপালি পুত্র বিমলকে নগরবাসীদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন বুদ্ধের কাছে। কিন্তু তিনি গেলেন না। তিনি না যাওয়ার কারণ হচ্ছে, সে যদি বুদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায় তাহলে সেখানে ধর্মসভার অন্তরায় হতে পারে। কেননা বৈশালীবাসীগণ সবাই আম্রপালিকে চিনে ফেলবে। তখন হয়তো পুত্রের সামনে তাকে নানা কথা শুনতে হতে পারে। কারণ ধর্মসভায় সবাই তো আর ভালো মন নিয়ে বসে থাকে না। কেউ অপরকে অবজ্ঞা করার জন্যেও বসে থাকে। বিমল আমাকে খুবই ভালোবাসে। তার সামনে আমাকে কেউ খারাপ কথা বলে বসলে তখন সে এটা মেনে নিতে পারবে না, সহ্য করতে পারবে না। এই ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তার ধর্ম বোধগম্য হবে না। এইসব কথা ভেবেই আম্রপালি বুদ্ধের সাক্ষাতের জন্য গেলেন না। তবে তিনি যে ধর্মহীনা তা কিন্তু নয়। তিনি বুদ্ধকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন, মান্য করেন, বিশ্বাস করেন। সেদিন আম্রপালি তার প্রাসাদে বসেই বুদ্ধকে স্মরণ করতে লাগলেন। মনে মনে ভাবেন আজ যেতে পারিনি তো কি হয়েছে অন্য একদিন যাব। এদিকে বিমল ও নগরবাসীদের সাথে গিয়ে বুদ্ধকে বন্দনা করে একপাশে বসলেন। তখন ভগবান বুদ্ধ দেব-মানবের হিতার্থের জন্য, কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য, সেইখানে উপস্থিত পরিষদের উদ্দেশ্যে বুদ্ধগণের পর্যায়ক্রমিক ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। যেমন– দান কথা, তার ফলের কথা,

শীল কথা ও শীল পালনের সুফলের কথা, স্বর্গ কথা, স্বর্গের দেবগণের পঞ্চকামগুণ সুখময় কথা, কামনা বাসনা-দুঃখময় সমস্যা বাড়ানো ছাড়া কমায় না, নৈষ্ক্রম্যের সুফল ও লোভ, দ্বেষ, মোহহীন হলে অগাধসুখ পাওয়া যায় এইসব বিষয়ে ধর্মদান করলেন। তারপর বুদ্ধ মাংস চক্ষু অপসারণ করে মনোময় চক্ষুদ্বারা, তথা পরচিত্ত বিজানন জ্ঞানদ্বারা দেখলেন উপস্থিত পরিষদের মন এখন মধ্যম পর্যায়ে অবস্থান করছে- তখন পরিষদের উদ্দেশ্যে চারি আর্যসত্য ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। তারপর বুদ্ধ তার ব্যাখ্যা করে ধর্মদান সমাপ্ত করলেন। বুদ্ধের দেশনাটি অনেকের জন্য স্বার্থকতা লাভ করেছে কিন্তু একজনের চিত্তপ্রবাহ সূক্ষ্ম হল তিনি আগে যে চঞ্চলভাব ছিলেন কিন্তু বুদ্ধের ধর্মদেশনা শ্রবণের পর তার চঞ্চলতার ভাব কিছুটা সংযত হয়েছে। তিনি হলেন বুদ্ধের প্রতি প্রসন্নপরায়ণ। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন 'আম্রপালির পুত্র বিমল কোণ্ডিণ্য'। চলে আসার সময় অন্যান্যরা বুদ্ধকে নিয়ে জয়ধ্বনি দিলেও কিন্তু তিনি একদম নিঃশ্চুপ। তার মন অন্য ভাবনায় ডুবে গেছে। তিনি সারারাস্তা আনমনে কি যেন ভাবতে ভাবতে চলে এলেন প্রাসাদে। তখন আম্রপালি প্রাসাদের বেলকনিতে বসে বিমলের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি দূর থেকে বিমলকে আসতে দেখে একটু অবাক হলেন। কারণ আগে যেরকম হাসি-খুশি ভাব দেখা যেত তা আজ নেই। তিনি গভীর চিন্তায় পরে গেলেন- প্রিয় বিমলকে কেউ কিছু বলেছে কিনা, বিমল প্রাসাদে ঢুকতেই আম্রপালি জিজ্ঞেস করলেন বাবা বিমল তোমার কি হয়েছে, মুখ কালো কেন? বিমল বললেন- না তেমন কিছুই হয়নি, তবে একটি চিন্তায় ডুবে আছি। সেটা কিভাবে যে বলবো বুঝতে পারছি না।

আরে পাগল! মায়ের কাছে কোন কিছুই লুকাতে নেই। নির্ভয়ে বল কি হয়েছে? মা আমি আজকে বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে যা বুঝতে পারলাম গৃহবাসে থেকে সেগুলো পালন করা সম্ভব নয়। তাই চিন্তা করছি আমি প্রব্রজ্যাধর্মে দীক্ষালাভ করে বুদ্ধ শাসনে উপনীত হয়ে সেগুলো পালন করব। বিমলের এ কথা শুনে আম্রপালি মনে মনে একটু কষ্ট পেলেন। আমার জীবনের শেষ সম্বল বলতে একমাত্র বিমলই। এই বুঝি তাকেও হারালাম। তাকে ছাড়া যে, আমি অসহায়। আম্রপালি বিমলকে বুঝালেন কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হল। আম্রপালি বুঝতে পারলেন পৃথিবীর সমস্ত মনোরঞ্জন বস্তু যদি এখন তার সামনেও রেখে দিই তারপরও সে তার সংকল্প থেকে পিছপা হবে না। কি আর করার আম্রপালি নিরূপায় হলেন। অবশেষে আম্রপালি প্রব্রজিত হওয়ার জন্য অনুমতি দিলেন। বললেন যাও বাবা শীল, বিনয় রক্ষা করে, দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা কর। এই কথা শুনে বিমলের অন্তর কেঁপে উঠল। তিনি মনে অত্যাধিক প্রসন্নতা লাভ করলেন। তিনি যে পারমীপরায়ণ পুণ্যবান পুরুষ। পারমীবান ব্যক্তিকে কোনভাবেই আটকানো সম্ভব নয়-যখন কিনা তাদের দুঃখ মুক্তির শেষ সময় উপস্থিত হয়। তখন তাদের একমাত্র পন্থা হয়ে ওঠে বৈরাগ্যময়। তাদের লক্ষ্য

থাকে একমাত্র নির্বাণের দিকে। বিমলেরও তাই হয়েছে। তিনি যে বিপশ্যী বুদ্ধের কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করেছেন। সেই আশীর্বাদের ফল প্রদানের সময় যে এখন উপস্থিত হয়েছে। তিনি হবেন ইন্দ্রখীল তুল্য (নির্দিষ্ট কোন স্তম্ভ যেমন- সম্রাট অশোকের সিংহের চতুর্মুখ স্তম্ভের কথা বলা যায়।) তিনি হবেন তৃষ্ণামুক্ত। লাভ করবেন চির অমরত্ব সুখময় নির্বাণ। মা আম্রপালি থেকে অনুমতি পেয়ে পরদিন বিমল বুদ্ধের কাছে গিয়ে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষিত হলেন। প্রব্রজ্যা ধর্মেদীক্ষা লাভ করার পর বিমল কঠোরভাবে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা অনুশীলন করতে লাগলেন। তার এই কঠোর প্রচেষ্টার ফলে এবং অতীতের পুণ্য পারমীর হেতু থাকায় কয়েকদিনের মধ্যে বিমল অরহত্ত্বতা লাভ করলেন। তিনি হলেন অঝড়, অমর ও চিরস্থির। যার দেখা পাওয়ার জন্য বিপশ্যী সম্যক সম্বুদ্ধ শাসনকাল থেকে পারমী পূরণ করে এসছেন। বিমল কোণ্ডিন্য আজ তার দেখা পেয়েছেন। সত্ত্বগণের প্রধান শত্রু হচ্ছে- লোভ, দ্বেষ, মোহ। বিমল কোণ্ডিন্যর মন থেকেও এই প্রধান শত্রু গুলো মুছে গেছে। তিনি পৌঁছে গেছেন-স-উপাদিসেস নির্বাণে। তার অন্তর প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হল-তখন তিনি আনমনে বলে উঠলেন-

"আমি আম্রবৃক্ষে উৎপন্ন আম্রপালির গর্ভে, রাজা বিম্বিসারের ঔরসে উৎপন্ন হয়েছি। প্রজ্ঞারূপ কেতু দ্বারা মানরূপ কেতু ধ্বংস করেছি। মহাকেতু স্বরূপ ক্লেসমারকেও ধ্বংস করে এখন অর্হত্ত্ব-ফল লাভ করেছি বা সাক্ষাৎ করেছি।"

বিমল কোণ্ডিন্য অর্হত্ত্ব লাভ করার পর সুখেই অবস্থান করতে লাগলেন। তারপর বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর বিমল কোণ্ডিন্যর বন্ধু ভিক্ষুরা তাকে জিজ্ঞেস করলেন। ভান্তে বিমল, আপনি তো বুদ্ধের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছেন যে, ষড়াবিজ্ঞা ও প্রতিসম্ভিদা অরহত হিসেবে। ভান্তে বিমল তাহলেতো আপনার অতীত জীবন নিয়েও অবগত হবেন। ভান্তে আমরা আপনার কাছে এই বিষয়ে জানতে চাই।

বর্তমান জীবনে কাকে দেখে এবং কার উপদেশে বুদ্ধ শাসনে আসার জন্য উৎসাহ পেয়েছিলেন? ভিক্ষুদের অনুরোধে পূজনীয় বিমল ভান্তে অতীত জীবনবৃত্তান্ত বলতে আরম্ভ করলেন- "লোকের মধ্যে যিনি লোকশ্রেষ্ঠ, নরের মধ্যে যিনি নরসিংহ, সেই মহাকারুণিক বিপশ্যী ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ একসময় ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক উপাসিকা, এ চারপরিষদের মধ্যে অমৃতময় ধর্মসুধা, অমৃতপম তথা অমৃত পদ নৈর্বাণিক ধর্মদেশনা প্রদান করছিলেন।

সেই দ্বিপদশ্রেষ্ঠ (জ্ঞান-প্রজ্ঞা) ভগবান সম্বুদ্ধের ধর্মদেশনা শ্রবণ করে অতিপ্রসন্নচিত্তে আমি চারটি সুবর্ণ পুষ্প (সোনালীবর্ণের ফুল) সম্যক সম্বুদ্ধকে দান করেছিলাম। আমার দান করা সেই চারটি সুবর্ণ পুষ্পগুলো বুদ্ধের ঋদ্ধিশক্তির প্রভাবে বুদ্ধসহ উপস্থিত চারপরিষদের মধ্যে শামিয়ানা বা প্যান্ডেল এর মতো হয়ে ছায়া প্রদান করেছিল।

তখন ভগবান বুদ্ধ নিজশরীর থেকে এক আলোকবর্ষ বের করেছিলেন ঋদ্ধিশক্তির প্রভাবে, সেই সোনালী বর্ণের আলোকবর্ষটি চতুর্দিকে বিঘোষিত হয়ে- সেই উজ্জ্বলতার প্রভাবে আলোয় আলোকিত হয়েছিল।

সেই মহা অসম্ভব সৌন্দর্যমন্দিত, অপরূপ দৃশ্যটি অবলোকন করে আমি ভগবান বিপস্‌সী সম্বুদ্ধের প্রতি অধির আগ্রহে, প্রসন্ন চিত্তপরায়ণ হয়ে, মনেপ্রাণে ভক্তি ও অসম্ভব শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়েছিলাম। আমি বিপস্‌সী সম্যক সম্বুদ্ধকে শ্রদ্ধা, অর্গ, বন্দনা নিবেদন করে, মনে মনে প্রার্থনা করেছিলাম, আমার এই পুণ্যের প্রভাবে আজ থেকে অনির্বাণকাল পর্যন্ত আমার দেহ যেন স্বর্ণের বর্ণ হয়। আমি বুদ্ধের কাছে এই প্রার্থনা নিবেদন করে নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছিলাম। ঘরে পৌছানোর পর একটি নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়লাম।

সেই নির্দিষ্ট আসনে বসে ভগবান বুদ্ধের গুণের কথা স্মরণ করতে করতে হঠাৎ কোনো এক অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করি। বুদ্ধের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন চিত্তপরায়ণ ছিলাম বলে মৃত্যুর সাথে সাথে আমি তুষিত দেব ভবনে উৎপন্ন হয়েছিলাম।

আজ থেকে একানব্বই কল্প পূর্বে আমি বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ, ও অরহতসহ খীণাস্রবগণের স্তূপে বহু পুষ্প দান করেছিলাম, সেই পুণ্যের প্রভাবে তারপর থেকে আমাকে একবার ও অপায় দুর্গতি ভূমিতে পড়তে হয়নি। এটি আমার বুদ্ধ পুজারই পুণ্যের ফল।

আজ হতে তেতাল্লিশ কল্প পূর্বে, আমি ষোলোবার 'নেত্তিসম্মত' নামক চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম। বিনাযুদ্ধে শুধুমাত্র ধর্ম আর ন্যায়নীতি দ্বারা পৃথিবী শাসন করেছিলাম। অন্তিম জন্মে আমি চার প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা লাভ করে ভগবান গৌতম সম্যক সম্বুদ্ধ শাসনে কৃতকার্য হয়েছি। – অর্থকথায় বিমল কোণ্ডিন্যর অপদান পাওয়া যায়নি। সুবর্ণপুপ্পিয় স্থবিরের জীবনীর সাথে বিমল কোণ্ডিন্যর জীবনী হুবহু মিল আছে বলে পাঠকদের বুঝার সুবিধার্থে– সুবর্ণপুপ্পিয় স্থবিরের জীবনী তুলে ধরা হয়েছে।)

পাদটীকা:

দ্বিপদশ্রেষ্ঠ অর্থ– যিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় দেব-মনুষ্যলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ, যার উপরে কোন জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় শ্রেষ্ঠ দেব-মানব নেই। সেকারণে বুদ্ধকে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছে।

বুদ্ধের করুণায় গণিকা থেকে নির্বাণের পথে

এদিকে পুত্র বিমল কোণ্ডঞঞ আপন শত্রুকে তথা লোভ, দ্বেষ ও মোহকে ভেঙে চুরমার করে নিজের সম্পত্তি ও পরম বন্ধু জ্ঞান-প্রজ্ঞার মাধ্যমে সুখেই অতিবাহিত করতে লাগলেন। কিন্তু বিমল কোণ্ডঞঞ এর মা আম্রপালি যেদিন থেকে পুত্র বিমল প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন সেদিন থেকে তিনি মনে বিন্দুমাত্র শান্তি পাচ্ছেন না, মনকে তিনি বুঝাতে চান, কিন্তু মন তাকে তোয়াক্কা করে না বা গুরুত্ব দেয় না। আম্রপালির মন বলে, তোমার প্রিয়তম ছিল মগধের অধিপতি-রাজা বিম্বিসার, তাকে কল্পনা-জল্পনায় রেখেছিলে বহুবছর। তার পথ চেয়ে কত ভাবনায় ডুব দিয়েছিলে এই বুঝি প্রাসাদে এসে আমায় ডাকবে প্রিয়তমা বলে। তিনি একবার এসে সেই যে গেছেন আর তো দেখা নেই। এবার তুমি একমাত্র সম্বল তোমার প্রিয়পুত্রকেও হারালে। যাদের জন্য তোমার এই বহুমূল্য প্রাসাদ, সিন্দুক ভর্তি ধনরত্ন, তারা যে নেই, তুমি একা এগুলো কি করবে? আম্রপালি দাও ছুঁড়ে ফেলে দাও, এই অমূল্য সম্পদ। এই জীবনে কত কিছুই তো করেছ কিন্তু একটা কাজও কি তোমায় সুখ দিতে পেরেছে? না পারেনি। শুধু ভোগ করেছ আর সামান্য অবলীলায় গলে গিয়ে দুঃখ পেয়েছ সুখ পাওনি। আম্রপালি একা একা এই সব চিন্তা করতে করতে একদিন শুনতে পেলেন ভগবান গৌতম সম্যক সম্বুদ্ধ পদার্পণ করেছেন বৈশালীতে। তাও আবার তারই পার্শবর্তী কোটিগ্রামে। আম্রপালি বুদ্ধের খবর পেয়ে শিহরিত হলেন। তার অন্তর বুদ্ধভক্তিতে পূর্ণ হল। তিনি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। এমনিতে এতদিন তিনি মনে মনে কামনা বা প্রার্থনা করছিলেন যে কবে ভগবান বুদ্ধের সাক্ষাৎ পাবেন একটিবার মাত্র বুদ্ধের অমিয় বাণী শ্রবণের আশায়। কিন্তু এখন সেই সময় এসে উপস্থিত হয়েছে। এই সুযোগ হাতছাড়া আর করলে চলবে না। এখন সুযোগে সদব্যবহার করতে না পারলে আর কখনও বুদ্ধের সাক্ষাৎ পাব না। আম্রপালি আবার ভাবেন– আমি যে বুদ্ধের কাছে যাব, আমার জন্যে বুদ্ধকে লোকের কাছ থেকে কটূক্তি শুনতে হবে নাতো?

বুদ্ধ যে রাজপুত্র সন্ন্যাসী, পবিত্র মহাপুরুষ, জ্ঞান-প্রজ্ঞায় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমি যে, বারবণিতা, আমার মন পবিত্রতর হলেও সকলেই জানে আমি একজন ঘৃণিতা। তারপর আম্রপালি আবার ভাবেন দূর পাগলী-কিচ্ছু হবে না। জগতে সত্য আর ন্যায়ের স্থিতি থাকলে এমন কোন শক্তি নেই যে থাকে পরাজিত করতে পারে। আমি তো আর বারাঙ্গনা বা বারবণিতা করার জন্য বুদ্ধের কাছে যাচ্ছি না। আমি যাব বুদ্ধকে একটিবার দেখার জন্য। নির্বাণের অমিয় বাণী শ্রবণের জন্য। আমার পুত্র বিমল- বুদ্ধের প্রতি, ধর্মের প্রতি ও সঙ্ঘের প্রতি এত এত পাগল হল কেন? তা জানার জন্য, বুঝার জন্যই তো আমি বুদ্ধের কাছে যাব। আম্রপালি এবার মন থেকে সকল চিন্তা ছুড়ে মারলেন শতমাইল দূরে।

তিনি স্থির করলেন আগামীকালই যাত্রা করবেন বুদ্ধের কুটিরের দিকে। তারপর তিনি গাড়ওয়ানকে বললেন রথ সাজাতে। বুদ্ধকে দান দেয়ার জন্য তিনি নিজেই কিছু জিনিস সংগ্রহ করে রাখলেন। পরদিন পূর্বের আকাশে সূর্যীমামা হাসির রসে সিক্ত হয়ে উদিত হলেন। সেদিন সূর্য উদয় হওয়ার সময় তার মুখে ছিল একরাশ হাঁসি। যেন ধরাতলকে কোন একটি খুশির সংবাদ প্রেরণ করছেন মুচকি হাঁসির ছন্দে। এদিকে সকাল পেরিয়ে দুপুর হতে চলল (শুরু করল) তখনি আম্রপালির যাত্রা করার মতো সবকিছু সাজানো-গোছানো হয়ে গেছে।

তিনি স্নান করা, খাওয়া-দাওয়া সবকিছুই এর মধ্যেই শেষ করেছেন। তারপর সময় যখন দুপুর, আম্রপালি তার বিশাল রথে উঠে পড়লেন। গাড়ওয়ান বা রথচালক রথ চালাতে লাগল আপন মনে। ঘর ঘর ঘর শব্দে রথ চলল বুদ্ধের অবস্থানের দিকে। বেশ কিছুক্ষণ রথ চলার পর রথ এসে থামল বিশাল এক আমবাগানের সামনে। আমবাগানের মাঝখানে বসে আছেন মহাকারুণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ। চতুর্দিকে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা এই চার পরিষদ বুদ্ধকে ঘিরে বসে আছে। সেখানে কেবল বুদ্ধের অমিয়বাণীর শব্দই শোনা যাচ্ছে, আর কোনো শব্দ নেই। সেদিন প্রকৃতি ও যেন বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণের জন্য উৎসুক হয়েছিল। হালকা মিষ্টি মিষ্টি বাতাস আপন মনে চলে। এদিকে আম্রপালি রথ থেকে নেমে বিশাল আমবাগানের ভিতরের দিকে যেতে আরম্ভ করলেন।

আম্রপালি গুটিগুটি পায়ে হেঁটে অবশেষে পৌঁছে গেলেন মূল গন্তব্য স্থলে। দূর থেকে বুদ্ধকে দেখামাত্রই তার অন্তর কম্পন দিতে শুরু করল। তার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। তার অন্তর বুদ্ধের প্রতি আরও গভীরভাবে ভক্তি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় ভরে উঠল। তিনি সভার এককোণে গিয়ে বসলেন। সেখানে উপবিষ্ট হয়ে বুদ্ধের অমৃত ধর্মরস শ্রবণ করলেন। তিনি বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শ্রবণ করে অতিশয় প্রসন্নপরায়ণ হলেন। এর আগে তিনি আজকের মত কোনোদিন অন্তরে খুশিভাব অনুভব করেননি। অবশেষে বুদ্ধের ধর্মদেশনা শেষ হলে আম্রপালি সঙ্গে যে দানীয় সামগ্রী নিয়ে এসেছিলেন, সেগুলো বুদ্ধসহ প্রমূখ ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে দান করলেন। তারপর আম্রপালি হাঁটুভেঙে বসে হাতজোড় করে মহাকারুণিক বুদ্ধকে বললেন ভান্তে ভগবান যদি অনুমতি দেন তো একটি বিষয় জানার ছিল? বুদ্ধ বললেন আম্রপালি তোমার মনে যা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে সব খুলে বলতে পার। তখন আম্রপালি বললেন– ভান্তে ভগবান আপনি কি শুধু রাজা-শ্রেষ্ঠীদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন? নাকী আমার মত অবলা নারীদের নিমন্ত্রণও গ্রহণ করে থাকেন। আম্রপালির তথ্যপ্রশ্ন-উত্তর দিতে গিয়ে বুদ্ধ বললেন- আম্রপালি আমি রাজা, শ্রেষ্ঠী, ধনী-গরীব, বারবণিতা কিংবা প্রজা এসব বাচ-বিচার না করেই ক্রমান্বয়ে সকলের মঙ্গলার্থে আমি সবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে থাকি। আম্রপালি

বুদ্ধের এই করুণার্থ বাক্য শ্রবণ করে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তারপর তিনি বুদ্ধসহ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে আগামীকালের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। বুদ্ধ নীরবে তথা মৌনভাবে আম্রপালির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ভগবান বুদ্ধ ফাং বা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন এই কথা বুঝতে পেরে আম্রপালি আবারও বুদ্ধকে বন্দনা করে, প্রফুল্ল ও প্রসন্ন মন নিয়ে বুদ্ধকে ডান পাশে রেখে সেখান থেকে চলে গেলেন।

পৃথিবীর দৃশ্যমান স্বর্গ হচ্ছে প্রাচীন বৈশালীনগর। সেই বৈশালীনগরের লিচ্ছবিগণও তখন শুনতে পেলেন যে, ভগবান বুদ্ধ বৈশালীতে আগমন করে এখন কোটিগ্রামে অবস্থান করছেন। তারপর লিচ্ছবিগণও সকলে সম্মিলিত হয়ে আলোচনা করার পর ঠিক করলেন তারাও বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করে তাদের নগরে নিয়ে যাবেন। যেমন কথা তেমনই কাজ, আর দেরী কিসের? তারাও সেদিন রথসজ্জিত করে নানা রং-বে-রং এর পোশাকাদি পরিধান করে সকলে সম্মিলিতভাবে কোটিগ্রামের দিকে যাত্রা করলেন। তখন তাদেরকে চেনাই যাচ্ছিল না, তারা দেবতা নাকী মানব। তাদের চেহারায় দীপ্তিময় আলো, চেহারায় অপার মায়া। তখন তাদের দেখতে মনে হচ্ছে স্বর্গ থেকে নেমে আসা একদল দেব-পুত্র। ঐদিকে আম্রপালিও রথ নিয়ে প্রাসাদের দিকে ফিরছেন, এদিক দিয়ে লিচ্ছবিগণও কোটিগ্রামের দিকে যাচ্ছেন। পথের মাঝখানে আম্রপালির সাথে হয় তাদের দেখা। সেদিন আম্রপালি লিচ্ছবিগণকে সম্মান দেখালেন না এবং দাঁড়িয়ে গেলেন না, রথও থামালেন না। তিনি আপন মনে রথ চালাতে লাগলেন। রাস্তাটি ছোট হওয়ায় এতে আম্রপালি রথের চাকার সাথে লিচ্ছবীগণের রথের চাকার ধাক্কা-ধাক্কি হল, ঘষাঘষি হল। আম্রপালির এসব কর্মকাণ্ডে লিচ্ছবিগণ জিজ্ঞেস করলেন ওরে জ্যোৎস্নাময়ী প্রিয় আম্রপালি ব্যাপার কি হ্যাঁ! অন্যদিনের চাইতে আজ তোমাকে অতিশয় প্রফুল্ল দেখাচ্ছে? তোমার সাথে সাথে যেন তোমার রথটিও হেলে দুলে নাচ করছে। সত্যি আম্রপালি এর আগে কোনোদিন এতটা খুশি হননি, আজ যতটা খুশি হয়েছেন। খুশি হওয়ারই কথা- কেননা যিনি কিনা এতদিন তিরস্কৃত হয়ে এসছেন, লোকের মাঝে এতদিন তিনি ছিলেন একজন ঘৃণিতা নারী। আজ সেই নারী কিনা জগৎপূজ্য ভগবান বুদ্ধকে ফাং করতে পেরেছেন, নিমন্ত্রণ করতে পেরেছেন। মহাকারুণিক বুদ্ধও নির্দিধায় তার নিমন্ত্রণ বা ফাং গ্রহণ করেছেন। তো আর কি লাগে। এর চেয়ে কি আর প্রয়োজন পরে।

লিচ্ছবিগণের এরূপ প্রশ্ন-উত্তর দিতে গিয়ে আম্রপালি বলেন– হে আর্য-পুত্রগণ! আমার খুশি বা প্রফুল্ল হওয়ার পেছনে দুটি কারণ রয়েছেঃ
এক নাম্বার কারণ হচ্ছে : আগামীকালের জন্য আমি জগৎপূজ্য তথাগত ভগবান বুদ্ধকে ফাং করেছি। আর ২ নাম্বার কারণ হচ্ছে : নারীর স্বভাব ধর্ম

হল- নারীরা মন থেকে কোন কিছু কামনা করলে বা কোন কিছু মন থেকে পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে, সেই ইচ্ছাটা যদি হঠাৎ পূরণ হয়ে যায়- তখন তারা একটু বেশি খুশি বা প্রফুল্লমনা হয়। আমার অনেকদিন ধরে একটি ইচ্ছা ছিল, আমি কখন জগৎপূজ্য তথাগত বুদ্ধকে নিজের প্রাসাদে ফাং করে আনতে পারব?

আর দেখতে দেখতে আজ সেই ইচ্ছা পূরণের সময়টি চলে এসেছে। আমার এতদিনের স্বপ্ন আগামীকাল তা বাস্তবে রূপান্তরিত হতে চলছে। আগামীকাল বুদ্ধসহ মহাভিক্ষুসংঘ আমার প্রাসাদে পা রাখবেন। তার জন্য আজ আমার এতটাই খুশি লাগছে তা আপনাদের বলে বুঝাতে পারব না।

লিচ্ছবি রাজপুত্রগণ আম্রপালির এসব কথা শুনে তাদের মনে বিষাদের রেখা দেখা দিল। তাদের মুখবর্ণ হল অবসন্ন। তাদের চেহারা হল ম্লানিত। তাদের মন বিষণ্নতায় ভরে যাওয়ার কারণ হচ্ছে যে, বুদ্ধের কাছে যাওয়ার তাদের উদ্দেশ্য ছিল তারাও বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করবেন তাদের নগরে। কিন্তু আম্রপালির মুখ থেকে আগামীকালের জন্য বুদ্ধের নিমন্ত্রণ ঠিক হয়ে গেছে এটা শুনার পর তাদের সেই আশা নিরাশায় পরিণত হল। তারপর লিচ্ছবি রাজপুত্রগণ বললেন– ওরে বুদ্ধ নাকী আম্রপালির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। তারা আম্রপালিকে বললেন ওগো প্রিয় আম্রপালি তোমার এই নিমন্ত্রণটি ফিরিয়ে নাও, তোমার নিমন্ত্রণটি আমাদেরকে দিয়ে দাও। প্রয়োজন হলে- লক্ষ মুদ্রা নাও, সোনা, জহরত, মণি-মুক্তা তোমার যা খুশি তা নিয়ে নাও তবুও এই নিমন্ত্রণটি ফিরিয়ে নিয়ে আমাদের দিয়ে দাও। লিচ্ছবিগণের এই লোভনীয় বাক্যটি শুনে আম্রপালি বললেন– আর্যপুত্রগণ, লক্ষমুদ্রা কেন, সমগ্র বৈশালীনগর, সমস্ত ধনরাশি সমস্ত মণিমুক্তা, হীরা- জহরত, বৈশালীনগরের সমস্ত দাস-দাসী আজ আমাকে দান করলেও বা উপহার দিলেও আমি এই মহান ভোজনান্ত বা মহান দানকার্যটি আপনাদের দিতে পারব না।

আমি চাই না এই মহান দান কার্যটি ফিরিয়ে নিয়ে নিজের অনুশোচনার কারণ হোক। আর্যপুত্রগণ, পুণ্যকাজে দেরী করতে নেই। অন্তরে যখনই পুণ্য চিত্ত বা কুশলচিত্ত উৎপত্তি হয় তা তখনই পূরণ করে নেয়া উচিত। সেই কুশল কর্মটি সাথে সাথে সম্পাদন করা উচিত। এই যে দেখুন না বুদ্ধকে ফাং করতে আপনারা দেরি করেছেন বলে, আজ আপনাদের মন বিষাদে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু আমি পুণ্য কাজে দেরি করিনি বলে আজ আমার মন বিষণ প্রফুল্ল ও প্রসন্ন। আজ আমি জিতে গেছি, আমার জয় হয়েছে। আমার অন্তর খুশিতে শিহরণ দিচ্ছে। তখন লিচ্ছবি রাজপুত্রগণ দেখলেন বা বুঝতে পারলেন-সাতসমুদ্র তেরোনদী পার হওয়া যতটা সহজ কিন্তু যিনি আত্মসংকল্পে অটুট, পুণ্যকাজে স্থির-সম্পন্ন, পুণ্যকাজে হাজারও বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হয়ে যিনি নিজ সংকল্প

থেকে চ্যুত হন না, তাকে পরাজয় করা অনেক কঠিন। এরূপ কথা চিন্তা করে সকলেই হাত তুলে, হাতের আঙ্গুল দিয়ে তুড়ি মেরে, লিচ্ছবি রাজপুত্রগণ বলে উঠলেন- ওরে আমরা এই আম্রপালির কাছে হেরে গেছি, আমরা পরাজিত হয়েছি। আমরা বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করা থেকে বঞ্চিত হলাম। এই আম্রপালিকে কত লোভ দেখালাম, মিনতি-বিনতি করলাম, তবুও তাকে তার সংকল্প থেকে একটুও চ্যুত করতে পারলাম না। আমরা ভাবলাম নারীরা সাধারণত অর্থ আর স্বর্ণের প্রতি লোলুভ হয় কিন্তু এই আম্রপালিতো তার উল্টো, যিনি কিনা অর্থ আর স্বর্ণের কথা শুনে পাগল হওয়ার কথা, তিনি কিনা আজ সবকিছু প্রত্যাখ্যান করে বুদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতি অটল শ্রদ্ধায় নিমজ্জিত। এরকম এককথার মানুষ আমরা জীবনে কখনো দেখিনি বাপরে বাপ! তাকে বশ করতে গিয়ে আরেকটু পরে বরঞ্চ আমরাই পাগল হয়ে যাব। চন্দ্রকে হাত দিয়ে স্পর্শ করার স্বপ্ন দেখা বা কল্পনা করা যেমন বোকামী, তদ্রুপ আজকে আম্রপালিকে অর্থ-সম্পদের লোভ দেখানোও পাগলামী ছাড়া কিছু নয়। এই কথা বলে লিচ্ছবি রাজপুত্রগণ দুঃখে, ক্ষোভে এবং ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কোটিগ্রামের দিকে যাত্রা করলেন।

এদিকে আম্রপালি ও প্রসন্ন পরায়ণ হয়ে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের কথা স্মরণ করতে করতে রথ চালাতে লাগলেন। আম্রপালি আরও চিন্তা করতে লাগলেন আগামীকাল যে বুদ্ধসহ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহা দান দিতে যাচ্ছেন। তিনি সেই কথাগুলো ভাবতে ভাবতে প্রাসাদে পৌঁছে গেলেন। পরদিন চারদিকে সুমিষ্ট ফুলের গন্ধ মনোরম বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। চতুর্দিকে নানান রঙের পাখিরা নানান রকম সুরে নিজের মত করে গান করছে, আর আপন খুশিতে নাচ করছে। অনন্ত আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খুবই মনোরম ও মনোমুগ্ধকর সকাল। ভগবান তথাগত গৌতম সম্যক সম্বুদ্ধও পাত্র-চীবর গ্রহণ করে বৃহৎ ভিক্ষুসংঘ নিয়ে আম্রপালির বাসভবনে যথাসময়ে উপস্থিত হলেন। ভগবান বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘরা যারযার আসনে বসে পড়লেন। আম্রপালি বিনয়ের সাথে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা করে আহারের ব্যবস্থা করলেন। তারপর নিজের হাতে প্রস্তুতকৃত খাদ্য দ্রব্যসমূহ নিজেই পরিবেশন করলেন। ভোজন করা শেষ হলে ভগবান বুদ্ধ হাত ধৌত করলেন। তারপর আম্রপালি একপাশে হাঁটু ভেঙ্গে বসে হাতজোড় করে বুদ্ধকে প্রার্থনা করলেন– ভান্তে ভগবান আমার বয়স হয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর কোন কালাকাল নেই, আর কদিন বাঁচি ঠিক নেই। মরার আগে আমি আমার আম্রউদ্যানটি বুদ্ধসহ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে দান করতে চাই। ভান্তে ভগবান আমার এই দানটি অনুমোদন করে আমাকে কৃতার্থ করুন। ভগবান বুদ্ধ, মৌনতার সাথে বা নীরবে আম্রপালির আম বাগানটি গ্রহণ করলেন। তারপর ভগবান বুদ্ধ ধর্মদেশনা করে আম্রপালিকে পরিতৃপ্ত করলেন।

স্ব-শিষ্য ভগবান বুদ্ধ আম্রপালির প্রাসাদ থেকে চলে যাওয়ার পর আম্রপালি গভীর চিন্তা মগ্ন হলেন। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন আমি তো বুদ্ধকে আমার

সুরম্য আমবাগানটি দান করেছি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি বুদ্ধকে কিছু একটা দিইনি। সেই জিনিসটা যে কি তিনি সেটা ভাবতে লাগলেন। চিন্তা করতে করতে আম্রপালি বুঝতে পারলেন, জায়গা দান করেছি বটে কিন্তু বসবাসের উপযোগী করে দান করিনি। তিনি আবার ভাবেন বুদ্ধের কাছে গিয়ে কি অনুমতি নেব? পরক্ষণে আবার চিন্তা করলেন আমি শুনেছি ভগবান বুদ্ধ নিজেও বিহার দানের অনুমোদন দিয়েছেন, আর ভিক্ষুসংঘকেও বিহার দান অনুমোদনের জন্য অনুমতি দিয়েছেন। বুদ্ধের কাছে না গিয়ে বরঞ্চ আমি আগে একটি নন্দিত বিহার নির্মাণ করে দিই। বিহারের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে তারপর না হয় আবার স্ব-শিষ্য বুদ্ধকে ফাং করব। তারপর বিহার দান করে স্ব-শিষ্য বুদ্ধের কাছে উৎসর্গ করে দেব। যেমন চিন্তা তেমনই কাজ, প্রয়োজনীয় কর্ম বা কাজ ফেলে রাখতে নেই। আগের কাজ আগে করে নেয়া উত্তম মঙ্গল। তারপরদিন আম্রপালি একজন সুদক্ষ মিস্ত্রিকে ডেকে এনে বিহার নির্মাণের জন্য লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা হাতে দিয়ে বিহার নির্মাণ কাজে লাগিয়ে দিলেন। সেই সুদক্ষ মিস্ত্রি একমাসের মধ্যে বিহার নির্মাণ করে দিলেন। আর এই বিহার নির্মাণ কাজ পরিচালনা করেছিলেন স্বয়ং আম্রপালি নিজেই। সেই সুরম্য নন্দিত প্রাসাদ সমতুল্য বিহার নির্মাণ কাজ শেষ হলে বুদ্ধসহ ভিক্ষুসংঘের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সবকিছুই সংগ্রহ করে দান করে দিলেন আম্রপালি। সবকিছু দেয়ার পরও কোনো কিছু অপূরণ আছে কিনা ঘুরে ঘুরে পুরো বিহার দেখে নিলেন আম্রপালি। সবকিছু ঠিকঠাক আছে দেখে আম্রপালি পরদিনের জন্য স্ব-শিষ্য বুদ্ধকে আবার ফাং করলেন। পরদিন স্ব-শিষ্য বুদ্ধ যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে নিজ আসনে উপবিষ্ট হলেন । ভিক্ষুসংঘরাও নিজেদের আসনে বসে পড়লেন। আম্রপালি বুদ্ধসহ ভিক্ষুসংঘকে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করলেন। ভোজন শেষ হলে বুদ্ধ হাত, মুখ ধুয়ে নিলেন। তারপর আম্রপালি বুদ্ধকে বললেন– ভান্তে ভগবান আমার আমবাগানে নির্মিত নন্দিত সুরম্য প্রাসাদ সমতুল্য বিহারটি আমি স্ব-শিষ্য বুদ্ধকে দান করে উৎসর্গ করে দিতে চাই। ভান্তে ভগবান যদি আমার দানটি অনুমোদন করেন তাহলে আমি অনেক কৃতার্থ হবো। ভগবান বুদ্ধ বিহারটি অনুমোদন করলেন। আম্রপালি বিহার দান করে উৎসর্গ করার পর মনেমনে নিজেকে খুবই হালকা মনে করলেন এবং নিজেকে খুবই ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী ভাবলেন। তিনি বিহার দান করতে পেরে এতটাই প্রসন্নচিত্ত হয়েছিলেন যে, তার জন্য তার শরীর থেকে জ্যোতি বের হয়েছিল।

এক মহাজালের বাধন মুক্তি

প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য আছে সৌভাগ্য যেদিকে যায় সেদিকে সবকিছু পরিপূর্ণ করে দিয়ে যায়। এই আলোকে বুদ্ধের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়– শীলবান ও পারমীবান ব্যক্তির অতীত ও বর্তমানে অর্জিত স্বীয় কুশল কর্মের ফল যখন দিতে আরম্ভ করে তখন পুণ্যবান ব্যক্তি কেবল সুখই দর্শন করেন দুঃখ দর্শন করেন না। অম্রপালিরও তাই হয়েছে। যেদিন পুত্র বিমল বুদ্ধ শাসনে প্রবেশ করেছিলেন সেদিন থেকে অম্রপালির কেবল মঙ্গল দর্শন হচ্ছে। অন্তরে বারংবার উৎপন্ন হচ্ছে কুশল চিন্তা। করে যাচ্ছেন কেবল কুশল কর্ম। কিন্তু আজকে ব্যতিক্রম কিছু লাভ করতে যাচ্ছেন আম্রপালি। তিনি যেদিন বিহার দানসহ ও বিহারটি উৎসর্গ করেছিলেন সেদিন সৌভাগ্যবশত ভিক্ষুসংঘের সাথে আম্রপালির পুত্র ‘বিমল কোণ্ডিণ্য’ও সঙ্গে এসেছিলেন। অর্থাৎ ঐদিন আম্রপালি পুত্র বিমল কোণ্ডিণ্যও উপস্থিত হয়েছিলেন নিজগ্রামে। সেদিন বিহার উৎসর্গ করার পর ধর্মদেশনার দায়িত্ব পড়েছিল আম্রপালির পুত্র পূজ্য ভান্তে বিমল কোণ্ডিণ্য ওপর। বিমল কোণ্ডিণ্য ও ধর্মদান করার দায়িত্ব পেয়ে মাতা আম্রপালির প্রতি করুণাবশত হয়ে এমন সুমধুর ধর্মদেশনা আরম্ভ করেছিলেন যা পুরো বিহার জুড়ে প্রসন্নতায় পঞ্চমুখ হয়ে ভরে ওঠেছিল। বিমল কোণ্ডিণ্য ভান্তে যখন ধর্মদেশনা আরম্ভ করেছিলেন তখন বিহারের চারদিক নীরব ও শান্তশিষ্ট হয়ে ওঠে। যেন মনে হচ্ছিল প্রকৃতিও সেদিন বিমল ভান্তের ধর্মদেশনা শ্রবণ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল বহুদিন ধরে। বিমল কোণ্ডিণ্য ভান্তে অনেক্ষণ ধর্মদেশনা করার পর পরিশেষে চারি আর্যসত্যের নিগূঢ়তত্ত্ব ধারাবাহিকভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখা করে ধর্মদান সমাপ্ত করলেন।

দেশনা শেষ হওয়ার সাথে সাথে বুদ্ধ বিমল কোণ্ডিণ্য ভান্তেকে তিনবার সাধুবাদ দিয়ে প্রশংসা করলেন। সাধু, সাধু, সাধু, বিমল তুমি অত্যন্ত নিগূঢ়তত্ত্ব ধর্মদান করেছো। তোমার ধর্মদেশনা অতিশয় চিত্তাকর্ষক হয়েছে। বুদ্ধের এই প্রশংসার বাক্য শেষ হলে তখন সেখানে উপস্থিত চারিপরিষদের মধ্যে বিমলের প্রতি সাধুবাদের রোল পরে যায়।

এই সাধুবাদটি সাধারণ সাধুবাদ ছিল না, সেই চারিপরিষদের সাধুবাদটি বিহারের সীমানা পেরিয়ে, আকাশ মার্গ পেরিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনকেও কম্পিত করেছিল। আম্রপালি পুত্রের প্রতি হলেন অতিশয় প্রসন্ন।

[ভিক্ষুসংঘ, ভিক্ষুণীসংঘ, উপাসক সংঘ, উপাসিকাসংঘ]

তিনি পুত্রের প্রতি হলেন কৃতজ্ঞ। বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতি শরণাম্বিত হলেন আজীবনের জন্য। আম্রপালি বুঝতে পারলেন বুদ্ধের নিগূঢ়তত্ত্বের মৌলিক ও মূল ধর্ম। তিনি এটাও বুঝতে পারলেন তার পুত্র তাকে এত ভালোবাসার পর ও কেন তাকে ছেড়ে চলে গিয়ে প্রব্রজ্জিত হয়েছিলেন। আম্রপালি এসব চিন্তা করে মনে মনে স্থির করলেন আগারিক জীবনে আর থাকা চলে না। এই গৃহি জীবনে মন কেবল ভোগ বিলাসের দিকে যেতে চায়। অশরীরি এই সুপ্ত ও সুক্ষ মনকে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে থাকা সমস্ত বস্তু দান করলেও তিনি পরিতৃপ্ত হবে না। না না মনের কথা অনেক শুনেছি আর শুনব না। এখন শুধু বুদ্ধের কথা, ধর্মের কথা, ও সঙ্ঘের কথা শুনব। ত্রিরত্ন ব্যতিত আমার আর কোন শরণ নেই, বন্ধু নেই। এসব কথা ভাবতে ভাবতে আম্রপালির মন হয়েছে বৈরাগ্যময়। তার মন বৈরাগ্যের দিকে ধাবিত হল। তিনি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলেন বুদ্ধের কাছে। বুদ্ধও আম্রপালির প্রব্রজ্যা প্রার্থনা অনুমোদন করে এক ভিক্ষুণীকে বললেন আম্রপালিকে প্রব্রজ্যা দেওয়ার জন্য। সেই ভিক্ষুণীটি আম্রপালিকে একটি রুমে নিয়ে গিয়ে প্রব্রজ্যা দিলেন। আম্রপালি হলেন ভিক্ষুণী।

তিনি এতদিন শুধু বারবণিতা বা গণিকা আম্রপালি নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তিনি এখন আর গণিকা নেই। তিনি লাভ করলেন একটি নতুন নাম। তিনি পরিচিতি লাভ করলেন গণিকা আম্রপালি থেকে ভিক্ষুণী আম্রপালি নামে। আম্রপালি ভিক্ষুণী হওয়ার পর সুখেই শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা অনুশীলন করতে লাগলেন। একদিন তিনি নির্জনে বসে একা একা ভাবতে লাগলেন– ওহো! আমি যখন যুবতী ছিলাম তখন কতই না বোকা ছিলাম। যৌবনকালে কেবল পঞ্চকামগুণে মত্ত ছিলাম। তখন পঞ্চকামগুণের নেশায় মত্ত ছিলাম বলে একটিবারও চিন্তা করতে পারিনি একদিন এই ভরা যৌবনে অমাবস্যার কালো রাত দেখা দেবে। বাঁকা ধনুকের ন্যায় ধারণ করবে এই শরীর। তখন ভালো ভালো উপদেশগুলো কর্ণগোচর করতে পারিনি। যৌবনকালে কোন জ্ঞানী মানুষ বা ব্যক্তি শিক্ষণীয় উপদেশ দিলে তখন মনে হতো যেন কেউ ধারালো সুচ দিয়ে সাড়া শরীরে আঘাত করছে। তখন শিক্ষণীয় উপদেশগুলো ডানকানে প্রবেশ করে বামকান দিয়ে বের হয়ে যেত। বয়স্কদের প্রতি ঘৃণ্যভাব জাগ্রত হত। সম্মানবোধটা অন্তর থেকে কেন জানি উৎপন্ন হতে চাইত না। সেসময় অন্তরে একটিবারও জাগ্রত করতে পারিনি যে, আমিও একদিন বুড়ো হব। তখন অন্তরে স্থাপিত ছিল কেহ। যৌবনে কতো রাজা-শ্রেষ্ঠীর মনোরঞ্জন করেছি। নাচে-গানে, রূপে-গুণে কতো মাতাল হয়েছি। রাজা, শ্রেষ্ঠীর যুবকরা যখন আমার প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খেত তখন মনে হতো কেবল আমিই সেরা, বাকী সবাই ঠুংক। হায়রে জীবন তখন কতো অহংকারে মেতেছি। কিন্তু এখন জরা, বার্ধক্য গ্রাস করে সেই যৌবনের অহংকারের শক্তি নিমিষেই খচে পড়েছে। ভিক্ষুণী আম্রপালি এসব বিষয়গুলো ভাবতে ভাবতে কোথায় যেন হারিয়ে যেতেন। তিনি মাঝে মাঝে অতীতের কথা চিন্তা করে খুবই ব্যাতিত হতেন বা

আফসোস করতেন। আগে কেন বুদ্ধের সাথে সক্ষাৎ হল না। আগে যদি বুদ্ধের সাক্ষাৎ পেতাম তাহলে জীবনটা এতদিন অনেকটা এগিয়ে যেত। তিনি আবার ভাবেন আগে সাক্ষাৎ হয়নি তো কি হয়েছে, এখন তো হয়েছে, আগে বুদ্ধের অমিয়বাণী শুনতে পায়নি কি হয়েছে, এখন তো শুনেছি বা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। ভিক্ষুণী আম্রপালি আবার নিজেকে নিজেই উপদেশ দিতেন। আম্রপালি তুমি এখন গৃহি নও, তুমি এখন ভিক্ষুণী। অতীত নিয়ে পরে থাকা তোমার শোভা পায় না।

অতীতের চিন্তা-ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দাও। বর্তমানের জীবনটা পবিত্রময়, চেষ্টা কর, এই পবিত্রময় জীবনকে উর্ধ্বের দিকে নিয়ে যেতে। প্রব্রজ্যা জীবন সহজ নয়। একবার হারালে আর পাবে কিনা ঠিক নেই। পরবর্তী জীবনে কোন কুলই বা তোমার আশ্রয় হবে তা ঠিক নেই তাই নিজের মনচিত্তকে সরাগের দিকে নয় বিরাগের দিকে ধাবিত কর। অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম এই ত্রি-লক্ষণ উপলব্দি করার চেষ্টা কর।

আম্রপালি ভিক্ষুণী হওয়ার পর থেকে দেহের ভঙ্গুরতাকে জানার চেষ্টা করতে লাগলেন। পুত্র বিমল যেভাবে উপদেশ দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবেই নিজেকে পরিচালিত করার চেষ্টা করেন। তিনি অন্ধকার থেকে আলোকিত জীবনের সুবাসের দিকে উঁকি দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার শত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। আম্রপালি যেন আলোর কাছাকাছি গিয়েও আলোর দেখা পান না, কারণ তিনি যে সবেমাত্রই মশাল তৈরি করছেন। মশালের মধ্যে আগুন ধরানোর এখনও সময় হয়নি। এই মশালটি যে তৈরি করা সহজ ব্যাপার নয়। কেননা এই মশালটি সাধারণ জীবনে চলার ক্ষেত্রে আলো দানকারী মশাল নয়। এটি এমন এক মশাল যে মশাল প্রজ্জ্বলিত হলে (জীবনের) দুঃখের অবসান ঘটে। আম্রপালি যে মশালটি তৈরি করার চেষ্টা করেন তা হচ্ছে– জ্ঞান প্রজ্ঞার মশাল। এই জ্ঞান প্রজ্ঞার মশাল তৈরি হয়ে গেলে তিনি সর্ব দুঃখ অবসানের আলো জ্বালাতে পারবেন। তখন তিনি হবেন অর্হৎ। লাভ করবেন স-উপাদিসেস নির্বাণ। তার থাকবে না, আর কোনো করণীয় কর্তব্য। তখন তিনি কেবল জীবিত থাকবেন সত্ত্বগণের কল্যাণের ত্বরে। তারপর জীবনের বায়ু থেমে গেলে তিনি লাভ করবেন নির্বাণ। চলে যাবেন চিরনিদ্রায়। যে নিদ্রা গেলে আর কখন ও জাগ্রত হওয়া যায় না। তখন কর্ম, চিত্ত সম্পূর্ণ ঘুমিয়ে পড়বে। তখন তার হবে প্রকৃত মৃত্যু।

বি.দ্র. অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম জ্ঞান উপলব্দি হলে– চারিমার্গ থেকে যেকোন একটি মার্গ জ্ঞান লাভ করা যায়। যথা– স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ।

সেদিন আম্রপালি একটি বড় আমগাছের নিচে তার আসনটি রেখে অর্থাৎ তিনি যে আসনটিতে বসে ধ্যান করতেন সেই আসনটি গাছের নিচে সমান জায়গায় রেখে বসে পড়লেন। তিনি ভিক্ষুণী হওয়ার পর থেকে কেন জানি সঙ্গপ্রিয়তা, লোক সমাগমে ও থাকতে চাইতেন না। তাই তখন ও তার আশে পাশে কেউ না থাকায় পরিবেশটি ছিল নীরব ও শান্ত। তিনি সেই নীরবতার সুযোগে যৌবন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত শরীরে কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা চিন্তা করতে লাগলেন। তখন তিনি চিন্তার গভীরে গিয়ে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেললেন কোনো এক অজানার দেশে। আম্রপালি যখন এই ভাবনাগুলো করতে লাগলেন, তখন তিনি কল্পনার মাধ্যমে ঠিক তার মতো আরেকটি রূপকায় আম্রপালি তৈরি করে নিলেন ঠিক তার সামনে কয়েক হাত দুরত্বে। তিনি সেই কল্পনার মূর্তিতে নিজের যৌবনকালের ব্যয়শীলতাকে দেখতে লাগলেন খন্ড খন্ড করে। তখন আম্রপালি নিজের অন্তরে তৈরি করা নিজের রূপকায় মূর্তিতে উদয়-ব্যয়শীলতার মাঝে ডুব দিয়ে, আনমনে নিম্নের গাথাগুলো বলতে লাগলেন:

১। এক সময় আমার কেশ ভ্রমরকৃষ্ণবর্ণ ও কুঞ্চিতাগ্রস্থ ছিল। জরাগ্রস্থ হয়ে তা এক্ষণে বল্কল বস্ত্রের আকার ধারণ করেছে; সত্যবাদীগণের বচন কখনো বৃথা হয় না।

২। ঔ কেশ পুষ্পাভরণে ভূষিত হয়ে পূর্বে সুগন্ধি প্রসাধন সমুদ্গোর মধুর গন্ধ বহন করত; এক্ষণে জরাগ্রস্থ হয়ে তা শশকলোম গন্ধবিশিষ্ট হয়েছে। সত্যবাদীগণের বচন কখনো বৃথা হয় না

৩। সুরোপিত নিবিড় উপবনের ন্যায়, কঙ্কতিকা ও সূচিশোভিত সুবিন্যস্ত ঐ কেশ রাশি এক্ষণে জরাগ্রস্থ হয়ে বিরল ও আলুলায়িত। সত্যবাদীগণের বচন কখনো বৃথা হয় না।

৪। বেণী সুশোভিত স্বর্ণালংকার ভূষিত উজ্জ্বল কৃষ্ণ কেশরাজি জরাগ্রস্থ হয়ে এক্ষণে শির হতে স্খলিত। সত্যবাদীগণের বচন কখনো বৃথা হয় না।

৫। আমার ভ্রূযুগল পূর্বে চিত্রকরের অংকিত ভ্রুর ন্যায় প্রতীয়মান হতো। জরাগ্রস্থ হয়ে তা এক্ষণে বলিবিশিষ্ট ও প্রলম্বিত। সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না।

পাদটীকা:
বুদ্ধ (সম্যক সম্বুদ্ধ) ও তার শ্রাবক সংঘের মূল উপদেশ বা মূল শিক্ষা হচ্ছে জগতের সব কছু উদয়-ব্যয়শীল বা পরিবর্তনশীল। বুদ্ধ ও তার শ্রাবকসংঘের ভাষিত শিক্ষাকে নির্দেশ করতে গিয়েই এখানে আম্রপালি "সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না" এই কথাটি ব্যক্ত করেছেন বা বলেছেন।

৬। আয়ত চক্ষুদ্বয় গাঢ়নীলবর্ণ মনির ন্যায় উজ্জ্বল ও জ্যোতিবিশিষ্ট ছিল। জরাগ্রস্থ হয়ে তা এক্ষণে শোভাহীন। সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না।

৭। নবযৌবনের কোমল সুদীর্ঘ নাসিকা জরাগ্রস্থ হয়ে এক্ষণে শুষ্ক ও কুঞ্চিত। সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না।

৮। পূর্বে আমার কর্ণদ্বয় সুগঠিত কঙ্কণের ন্যায় শোভিত হত, জরাগ্রস্থ হয়ে তা এক্ষণে বলিবিশিষ্ট ও প্রলম্বিত। সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না।

৯। কদলীমুকুল (কলার মোচা থেকে বের হওয়া ছোট কলার রং সদৃশ্য) বর্ণবিশিষ্ট আমার পূর্বের দন্তরাজি জরাগ্রস্থ হয়ে এক্ষণে ভগ্ন ও যবের ন্যায় পীতবর্ণবিশিষ্ট। সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না।

১০। বনচারিণী কোকিলার ধ্বনির ন্যায় আমার সুমিষ্ট স্বর জরাগ্রস্থ হয়ে এক্ষণে ভগ্ন। সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না।

১১। সুচিক্কণ শঙ্খের ন্যায় আমার মার্জিত গ্রীবাদেশ এক্ষণে জরাগ্রস্থ হয়ে ভগ্ন ও বিনষ্ট। সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না।

১২। সুগোল স্তম্ভ সদৃশ আমার বাহুযুগল জরাগ্রস্থ হয়ে এক্ষণে বিশুষ্ক পাটলী শাখার ন্যায় হয়েছে। সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না।

১৩। অঙ্গুরীয় ও সুবর্ণমণ্ডিত আমার কোমল হস্তদ্বয় জরাগ্রস্থ হয়ে এক্ষণে গ্রন্থিল। সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না।

১৪। স্থুল সুগোল উন্নত পূর্বের স্তনদ্বয় জরাগ্রস্থ হয়ে এক্ষণে জলশূণ্য লম্বিত চর্ম থলির ন্যায়। সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না।

১৫। মার্জিত সুবর্ণ ফলকের ন্যায় শোভিত মদীয় দেহ এক্ষণে সূক্ষ বলি আচ্ছাদিত। সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না।

১৬। হস্তীমুণ্ডের ন্যায় পূর্বের উরুদ্বয় জরাগ্রস্থ হয়ে এক্ষণে বেণু নলের ন্যায় প্রতীয়মান। সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না।

১৭। স্বর্ণ নূপুর শোভিত পূর্বের জঙ্ঘাদেশ জরাগ্রস্থ হয়ে এক্ষণে বিশুদ্ধ তিলদণ্ডকের ন্যায় হয়েছে। সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না।

১৮। আমার কোমল, পাদদ্বয় পূর্বে তুলা পূর্ণরূপে প্রতীয়মান হত। জরাগ্রস্থ হয়ে তা এক্ষণে শুষ্ক ও বলি আচ্ছাদিত। সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না।

১৯। এই দেহ এক সময়ে, ঐরূপ ছিল। এক্ষণে তা জর্জরিত, দুঃখের আলয়। ঐ জীর্ণাগার হতে প্রলেপ খসে পড়ছে। সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না।

আম্রপালি উপরের গাথাগুলো ভাষণ করে, যৌবনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত স্বীয় নিজের দেহের পরিবর্তনশীলতাকে একচিত্তে, এককেন্দ্রিকভাবে, একীভূত করে বিদর্শন ভাবনায় প্রবেশ করলেন। তখন আম্রপালি জগতের সবকিছু উদয়-ব্যয়শীলতাকে উপলব্ধি করলেন। এই অনিত্য, দুঃখঃ অনাত্মকে ধ্যানের বিষয় তথা স্মৃতিতে স্থাপন করে স্মৃতি করতে করতেই অচিরেই অর্হত্বপ্রাপ্ত হলেন। আম্রপালি হলেন বিমুক্ত চিত্ত। এখন তার লোভ, দ্বেষ ও মোহ চিরজীবনের জন্য বিনাশ হয়েছে। তার অন্তর হয়েছে বিমল বিশুদ্ধ। তিনি লাভ করলেন অর্হত্বফলের প্রীতি। জন্ম-জন্মান্তরের অকুশল কর্মের ফল থেকে তিনি হলেন চিরমুক্তি। তাকে আর গণিকা ধর্ম করতে হবে না। মার তাকে আর প্রলোভনে প্রলোভিত করতে পারবে না। তিনি হলেন খাঁচামুক্ত পাখি। তখন তিনি বিমুক্তির প্রীতি আস্বাদন বা অনুভব করতে করতে অপদানের নিম্নের গাথাগুলো আবৃত্তি করতে লাগলেন:

১। সেই সময় ষড়রশ্মিতে সমুজ্জ্বল ফুস্য মহামণি ছিলেন। আমি তাঁর বোন ছিলাম। আমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

২। তার কাছ থেকে ধর্মদেশনা শ্রবণ করে অত্যন্ত শ্রদ্ধাচিত্তে মহাদান দিয়ে আমি রূপসম্পদ প্রার্থনা করেছিলাম।

৩। পৃথিবীতে এখন হতে একত্রিশ কল্প পূর্বে লোক প্রদ্যোৎ, ত্রিলোকশরণ, লোকাগ্রণায়ক সিখী বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছিলেন।

৪। আমি সেই সময়ে অরুণ নগরে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে এক বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুণীকে ক্রুদ্ধ চিত্তে অভিশাপ দিয়েছিলাম।

৫। তাকে আমি 'বেশ্যা, অনাচারিণী, বুদ্ধ-শাসন কলুষিতা' বলে গালাগালি করেছিলাম। সেই পাপকর্মের ফলে আমি বিনিপাত নরকে গিয়ে ভীষণ দুঃখ ভোগ করেছিলাম। সেই স্থান হতে চ্যুত হয়ে আমি মানবলোকে এক সাধিকা হয়ে জন্ম নিয়েছিলাম।

৬। দশ সহস্র (হাজার) জন্ম ধরে আমি বেশ্যাবৃত্তি করেছিলাম। দূষিত বিষপান তুল্য এরপরও আমি সেই পাপ হতে উদ্ধার হতে পারিনি।

৭। কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনে আমি ব্রহ্মচর্যা পালন করেছিলাম। সেই কর্মের প্রভাবে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্ম নিয়েছিলাম।

৮। আমি এই অন্তিম জন্মে ঔপপাতিক সত্ত্ব হয়ে আম্রবৃক্ষের এক শাখায় জন্ম নিয়েছি। সেই কারণে সকলেই আমাকে "আম্রপালি" নামে চেনে।

৯। কোটি প্রাণীকুল পরিবেষ্টিত হয়ে জিনশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি। আমি

অচলস্থান নির্বাণ সাক্ষাৎ করেছি। আমি এখন বুদ্ধের ঔরসজাত কন্যা।

১০। আমি নানাপ্রকার ঋদ্ধি, দিব্যশোত্র, পরচিত্ত-বিজানন জ্ঞান পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছি। আমার দিব্যচক্ষু অতিশয় পরিশুদ্ধ। আমার সমস্ত আসক্তি পরীক্ষীণ হয়েছে । এখন আমার আর কোনো পুনর্জন্ম নেই।

১১। বুদ্ধশ্রেষ্ঠের অনুকম্পায়– অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চার প্রকার প্রতিসম্ভিদায় আমার পরিশুদ্ধ বিমল জ্ঞান উদয় হয়েছে।

১২। আমার সর্বক্লেশ বিদগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত পুনর্জন্ম বিনাশ হয়েছে এবং নাগ (গজার) সদৃশ সমস্ত শৃঙ্খল ছেদন করে এখন আমি সম্পূর্ণ রাগ-দ্বেষ-মোহ মুক্ত হয়ে বাস করছি।

১৩। বুদ্ধের নিকট আগমন করাটা আমার অত্যন্ত মঙ্গলপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা অধিগত করে বুদ্ধের ধর্মশাসনে পরিপূর্ণতা পেয়েছি।

১৪। চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা, আট প্রকার বিমোক্ষ ও ছয় প্রকার অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে বুদ্ধের ধর্মশাসনে আমি পূর্ণতা পেয়েছি।

আম্রপালি এই গাথাগুলো ভাষণ করার পর সেখান থেকে উঠে চংক্রমণে চলে গেলেন এবং বাকি জীবনটুকু তিনি সুখে অবস্থান করেছিলেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. থেরী গাথা- ভিক্ষু শীলভদ্র- (পৃষ্ঠা- ১০৯-১১৩)

২. বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা-(প্রথম খণ্ড)- (পৃষ্ঠা- ২২৫-২৩৫)

৩. বৌদ্ধরমণী - (পৃষ্ঠা- ৩৫-৩৭)ঃ

৪. পালি সাহিত্যে নারী-(পৃষ্ঠা- ১২৬-১২৯)

৫. বৌদ্ধ মহীয়সী নারী -(পৃষ্ঠা- ৮৪-৮৮)

৬. বুদ্ধ যুগে বৌদ্ধ নারী- (পৃষ্ঠা- ৮৪-৯৩)

৭. অপদান ২য় খন্ড (আম্রপালি থেরী অপদান)

৮. বৌদ্ধ মহীয়সী নারী- সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া। (পৃষ্ঠা- ৮৬-৯০)
প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩ ইং ১৪০০ বাংলা, নবযুগ প্রথম প্রকাশঃ এপ্রিল ২০২৫।

৯. প্রেতকাহিনী অর্থকথা- তিরোকুট্ট বা তিরোকুড্ড প্রেত-কাহিনী অর্থকথা বর্ণনা-
শ্রীমৎ রাহুল ভিক্ষু, (পৃষ্ঠা- ৬৯-৮৩)

১০. পেতবত্থু পালি (মূল ত্রিপিটক), পেতবত্থু অট্ঠকথা পালি ৫ নম্বর বর্ণনা,
(৬ষ্ঠ সংগায়নে অনুমোদিত ত্রিপিটক)

১১. নগরবধূ আম্রপালী- প্রভাত দে সরকার, (পুরো বই)

১২. ইতিহাসের বিচিত্র নারী-(থেরীগণের জীবনীর উপন্যাস) স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১নং কাহিনী।

১৩. সারনাথ বিবরণ- শ্রীভবতোষ মজুমদার।

১৪. আম্রপালি (হিন্দী ভাষায়)- রামচন্দ্র নারায়ণ ঠাকুর।

১৫. বৈশালী কি নগরবধূ- আচার্য চতুরসেন শাস্ত্রী।

১৬. বৈশালী কি নগরবধূ (২য় খণ্ড)- উত্তর প্রদেশ সরকার কর্তৃক পুরস্কার প্রাপ্ত, আচার্য
চতুরসেন এর মেয়ে শ্রীমতী কমলকিশোরী চতুরসেন কর্তৃক সংস্কৃত, সংস্করণঃ ২০১৫ ইং

১৭. ভবচক্র (বৌদ্ধ ধর্মে জন্ম-জন্মান্তরের রহস্য) মূললেখক- (এগার্টন সি. ব্যাপটিস্ট)
অনুবাদক-অধ্যাপক ড. সুকোমল চৌধুরী; এই বইটি সকল নারী-পুরুষের পড়া উচিত

১৮. মহাপরিনিব্বাণ সুত্তং - বিনয় বিশারদ, রাজ গুরু শ্রীধর্মরত্ন মহাস্থবির।

১৯. সচিত্র বৌদ্ধ তীর্থ পরিক্রমা - ড. বরসম্বোধি মহাস্থবির।

২০. সীবলীচরিত কথা - ড. ভিক্ষু সত্যপাল।

২১. AN - EARLY HISTORY OF VAISALI, (Yogendra mishra) সংস্করণঃ 1962

২২. VAISHALI - And The Indianization of Arakan, (Noel F. Singer).

২৩. Homage to vaisali (২য় সংস্করণঃ ১৯৮৫)

২৪. একত্রিশ লোকভূমি ও নির্বাণ (প্রকাশ ২০০৬ ইং)

২৫. সীবলী জীবনকথা (সুনীল কান্তি বড়ুয়া, প্র. ২০০৬)

২৬. শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত - মানদা দেবী, (প্রকাশ ১৯২৯)
এই বইটি নতুন প্রজন্মের সকল নারী- পুরুষকে পড়া উচিত।

২৭. পালি সাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগরজীবন- করুণানন্দ ভিক্ষু, (প্রকাশ ১৯৯৪)

২৮. যুগে যুগে নারী (প্রকাশ ১৯৫৭)

২৯. খুদ্দকপাঠ ও খুদ্দকপাঠ অর্থকথা বাংলা, করুণাবংশ থের (প্রকাশ ২০২৩)

৩০. পরমত্থজ্যোতিকা পালি (অট্ঠকথা) - (প্রকাশ নির্বাণ টিভি, শ্রীলংকা)

৩১. পালি সাহিত্যে নারী - ড. বাণী চট্টোপাধ্যায়।

৩২. লিচ্ছবী ইতিহাস (নেপালের চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)
ড. জগদীশচন্দ্র রেগমি।

৩৩. মূলত্রিপিটক দীর্ঘনিকায়, মহাবর্গ মহাপরিনির্বাণ সূত্র।

৩৪. বিনয়পিটক মহাবর্গ (পালি-বাংলা)

৩৫. বিনয়পিটক মহাবর্গ (পালি অট্ঠকথা ও টীকা)

৩৬. থেরগাথা অর্থকথা (পালি-বাংলা)

৩৭. থেরগাথা (পালি-বাংলা)

৩৮. বুদ্ধবংশ অট্ঠকথা (পালি)

৩৯. বুদ্ধবংশ (পালি-বাংলা)

৪০. থেরী অপদান (পালি-বাংলা)

৪১. থেরীগাথা (পালি-বাংলা)

৪২. থেরীগাথা অট্ঠকথা (পালি)

৪৩. পূর্ণিমা সন্দর্শন- এস. জ্ঞানমিত্র ভিক্ষু

বি. দ্র.- সকল সহায়ক গ্রন্থপঞ্জির নাম এখানে উল্লেখ করতে পারছিনা। কেননা পাঁচ শতেরও অধিক সহায়ক গ্রন্থ, ওয়েবসাইট, ম্যাগাজিন, গল্প, উপন্যাস, নাটকসহ বিবিধ সহায়িকার নাম ও লেখকের নাম লিখতে গেলে একটি ছোট্ট পুস্তক হয়ে যাবে। যেসব পুস্তকের নাম ও লেখকের নাম এখানে উল্লেখ করতে পারিনি আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

উপসংহার

পরিশেষে একটি কথা বলে বইটির কার্যক্রম শেষ করতে চাই। কোনো ব্যক্তি যতই জ্ঞানী পণ্ডিতের সঙ্গ পান না কেন, তিনি যদি নিজেকে গুছিয়ে নিতে না পারেন কিংবা নিজের অন্তরের গভীর স্রোতের অবস্থা বুঝতে না পারেন, তবে তার জীবন ভয়াবহ রূপ নিতে পারে; যার প্রমাণ হচ্ছে এই আম্রপালি। তিনি দান-ধর্ম থেকে শুরু করে এমন কোনো ভালো কাজ বাকি রাখেননি যা তিনি করেননি। এত কিছু করার পরও তার জীবনের পথচলা শেষ হয়নি অর্থাৎ তিনি নির্বাণ উপলব্ধি করতে পারেননি। তার জীবনচক্রটি অদ্ভুতভাবে ঘূর্ণায়মান ছিল, কারণ তিনি নির্বাণের সিঁড়ি খুঁজে পাননি। যদি খুঁজে পেতেন, তবে নিজেকে গুছিয়ে নিতেন; আর নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারলে তার নির্বাণ উপলব্ধি করা এত দীর্ঘ হতো না। তাই আমি বলব, জীবনে যত ভালো কাজই করেন না কেন, সেখানে যেন তিনটি কুশল কর্ম নিহিত থাকে। সেগুলো কী কী? দান, শীল ও ভাবনা। এই তিনটি কাজ সমানতালে চালিয়ে নিতে পারলে দুঃখের অবসান ঘটানো দ্রুত সম্ভব।

জয় হোক ভিক্ষুণী থেরী আম্রপালির।

চারটি মহাদ্বীপের আকার ও পরিমাণ:

'জম্বুদ্বীপ' দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ১০ হাজার যোজন বিস্তৃত এবং এটি গো-শকট আকৃতির অর্থাৎ গরু গাড়ির মত। 'অপর গোয়ান' ৭ হাজার যোজন বিস্তৃত এবং আয়নার মতো চারকোণা। 'পূর্ববিদেহ' ৭ হাজার যোজন বিস্তৃত এবং এটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি (চাঁদ অর্ধেক হলে যেমন দেখায়)। 'উত্তরকুরু' ৮ হাজার যোজন বিস্তৃত এবং এটি পীঠাকৃতি (অর্থাৎ বসার পিঁড়ির মতো)। এই জম্বুদ্বীপ ৯৬ হাজার পর্বত-চূড়া, ৫৬টি রত্নখনি, ৯৯ লক্ষ গ্রাম ও জনপদ এবং ৬৩ হাজার নগর দ্বারা সজ্জিত। এই জম্বুদ্বীপের ৪ হাজার যোজন বিস্তৃত এলাকা জলে ডুবে গিয়ে সমুদ্রে পরিণত হয়েছে। ৩ হাজার যোজন পরিমাণ স্থানে মানুষের বসতি এবং বাকি ৩ হাজার যোজন জায়গায় হিমালয় পর্বত অবস্থিত।

জম্বুদ্বীপ হিমালয়ে এক প্রকাণ্ড ও সুবিস্তৃত জম্বু গাছ (জামগাছ) আছে। এর মূলদেশ থেকে আগাগোড়া উচ্চতা একশ যোজন। গাছের কাণ্ডের পরিধি ১৫ যোজন এবং উচ্চতা ৫০ যোজন। এর মূলশাখাসহ বড় শাখা মোট ৫টি। প্রতিটি শাখা ৫০ যোজন পর্যন্ত লম্বা। এর ছড়িয়ে থাকা ডালপালার মণ্ডলাকার পরিধি তিনশ যোজন। এই মহাবৃক্ষের নাম অনুসারেই আমাদের এই দ্বীপ 'জম্বুদ্বীপ' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এই গাছের নিচ দিয়ে বড় বড় নদী বয়ে গেছে। সেই নদীগুলোর দুই তীরে পাকা জম্বুফল পড়ে সেগুলো ধীরে ধীরে সোনায়

পরিণত হয়। সেই সোনা সঠিক সময়ে জলস্রোতে ভেসে গিয়ে সমুদ্রে পড়ে। জম্বুনদী থেকে উৎপন্ন হয় বলে এই সোনার নাম "জম্বুনদ স্বর্ণ।"

মানুষদের জম্বু গাছ, অসুরদের চিত্তপাটলী, গরুড়দের সিম্বলী, অপরগোয়ান দ্বীপের কদম্ব, উত্তরকুরু দ্বীপের কল্পতরু, পূর্ববিদেহ দ্বীপের শিরীশ গাছ এবং তাবতিংস দেবলোকের পারিজাত বৃক্ষই অনন্য ও বিখ্যাত। এই গাছগুলো কল্পকাল স্থায়ী হয়। এগুলোর প্রত্যেকটি আকার, পরিধি ও উচ্চতায় জম্বু গাছেরই সমান।

বইয়ের ভেতরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীর ছবি

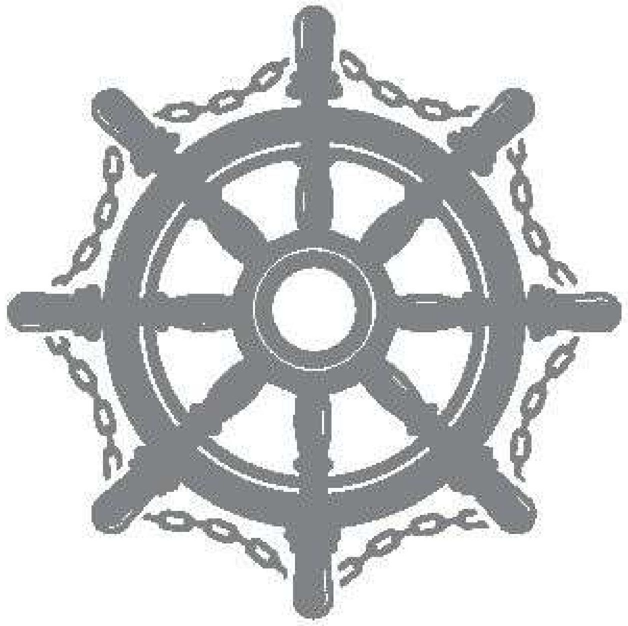

ফুস্য বোধিসত্ত্বকে প্রার্থনারত ১০ হাজার দেবতা

ফুস্য বোধিসত্ত্বের জন্ম

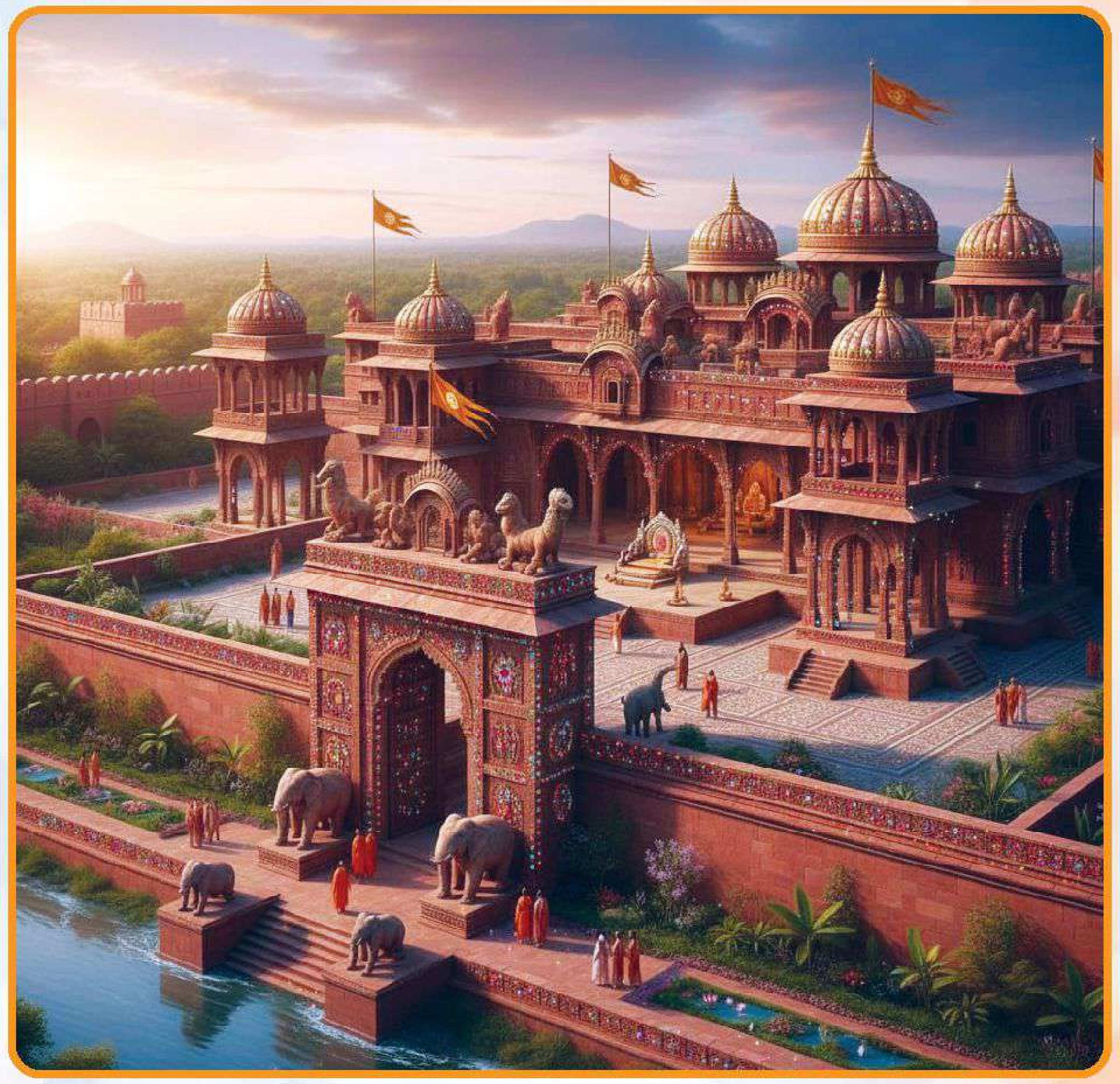

প্রাচীন বৈশালীনগরের নমুনা

আম্রপালির অন্তিম ঔপপাতিক জন্ম

ভাবী আম্রপালি অর্হৎ ভিক্ষুণীকে বেশ্যা বলার দৃশ্য

ভাবী আম্রপালি বৈমাত্রেয় ভাই ফুস্যবুদ্ধকে মহাদান দেওয়ার চিত্র

লিচ্ছবীরাজ আম্রপালিকে নর্তকীর হাল ধরতে অনুরোধ করছেন

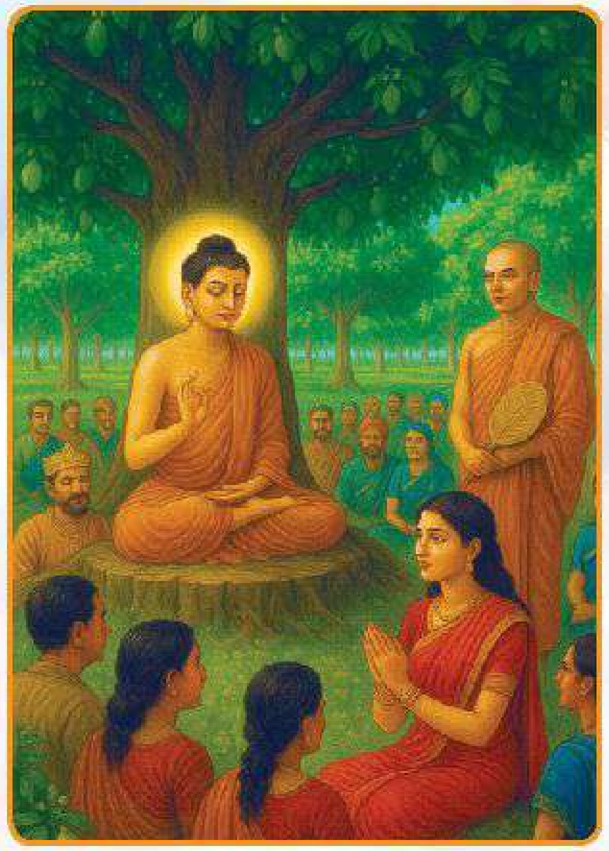

আম্রপালি গৌতমবুদ্ধকে নিজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করছেন

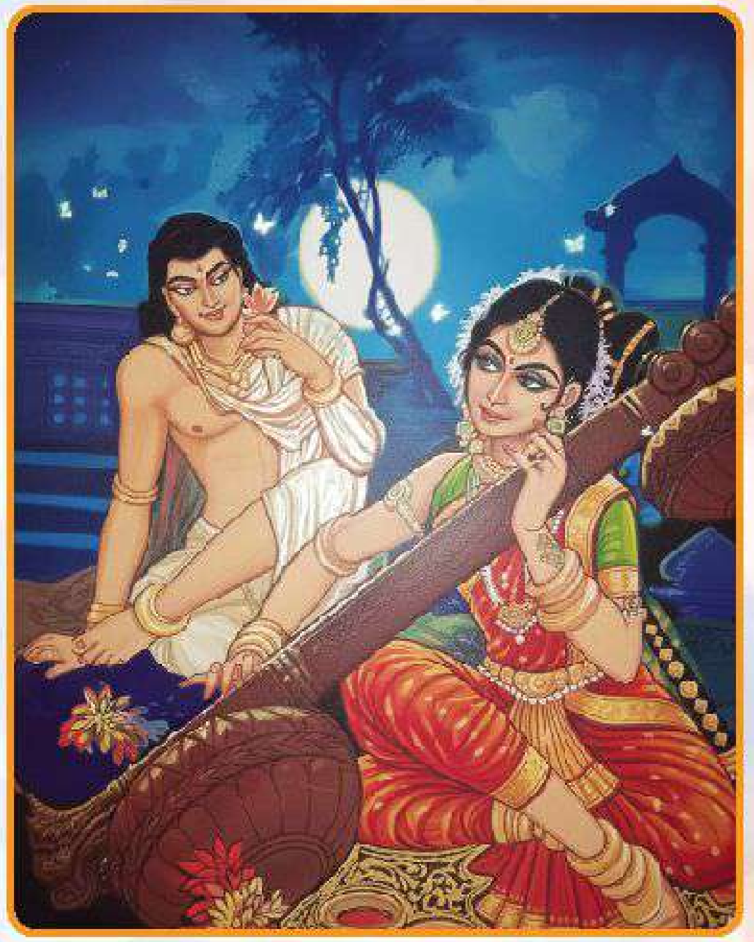

বিম্বিসার রাজা ও আম্রপালির গোপন প্রেম

আম্রপালিকে নর্তকী করার জন্য বৈশালিবাসীর বৈঠক

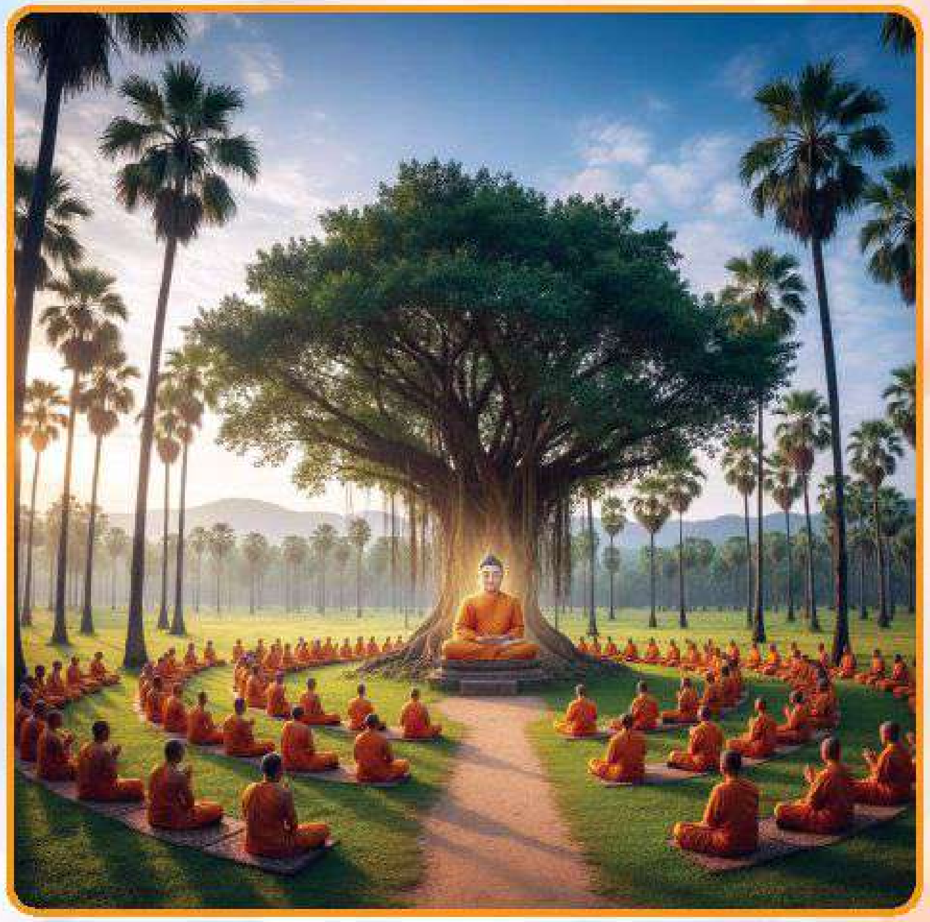

ভগবান গৌতমবুদ্ধ রাজগৃহের তালবাগানে অবস্থানের সময় চিত্র

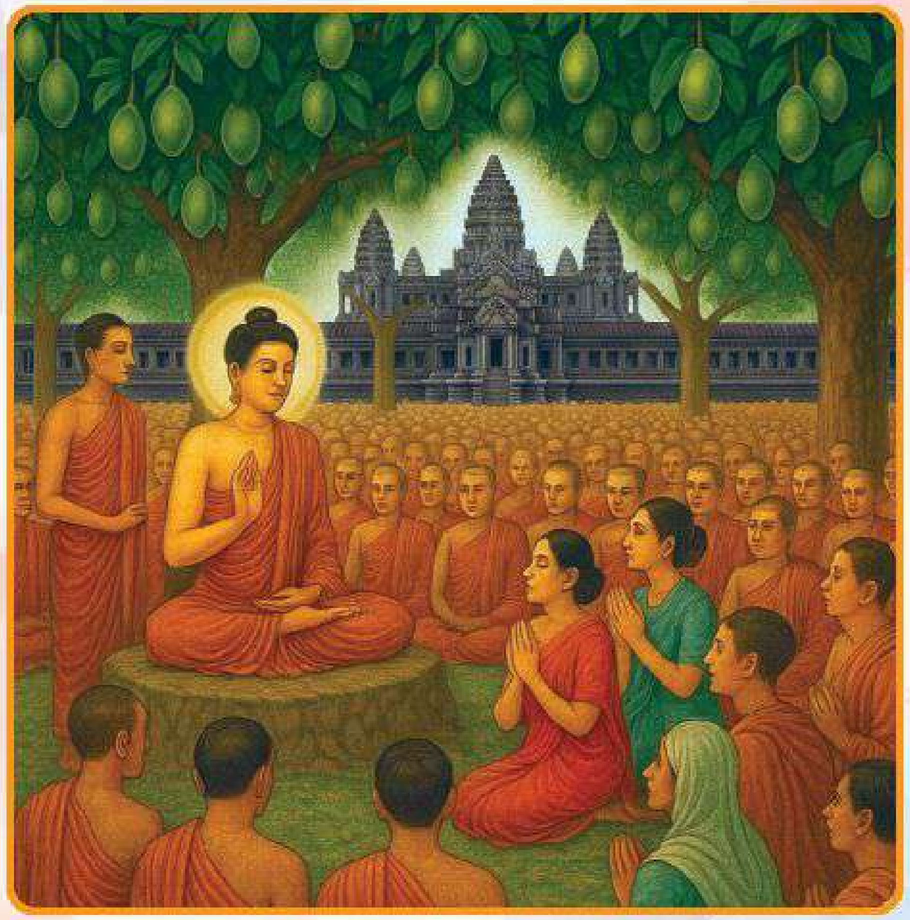

আম্রপালির নব নির্মিত বিহার দানের চিত্র

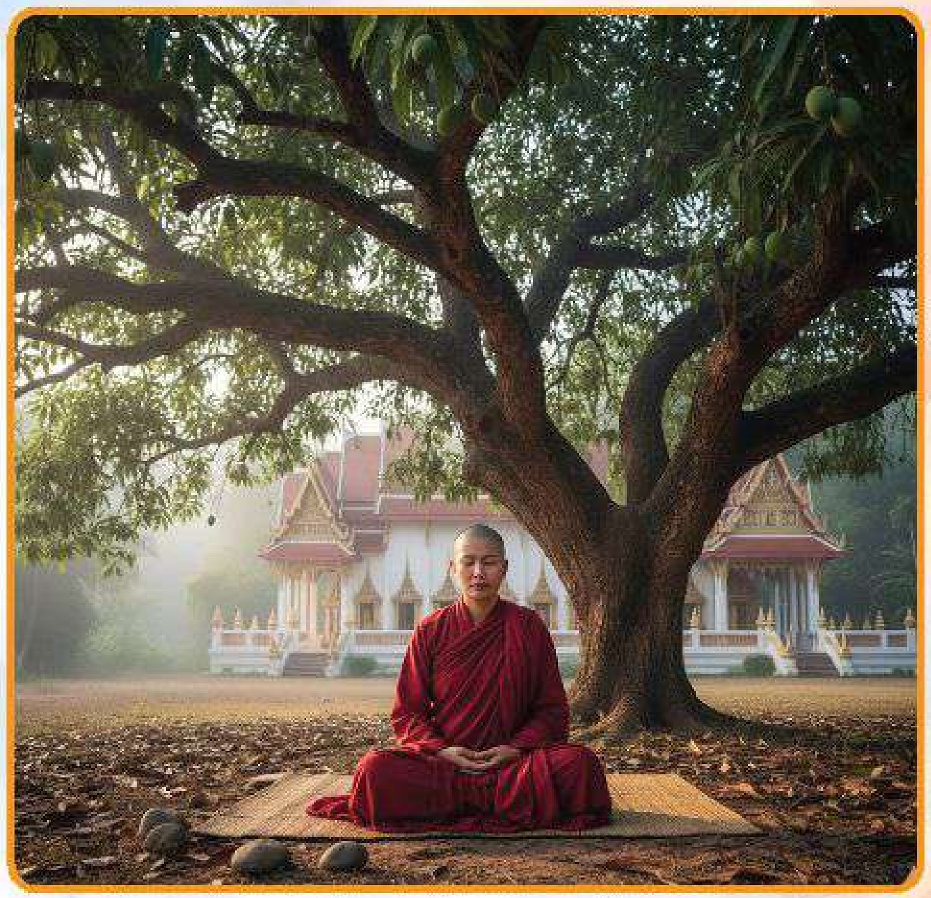

গভীর ধ্যানরত আম্রপালি

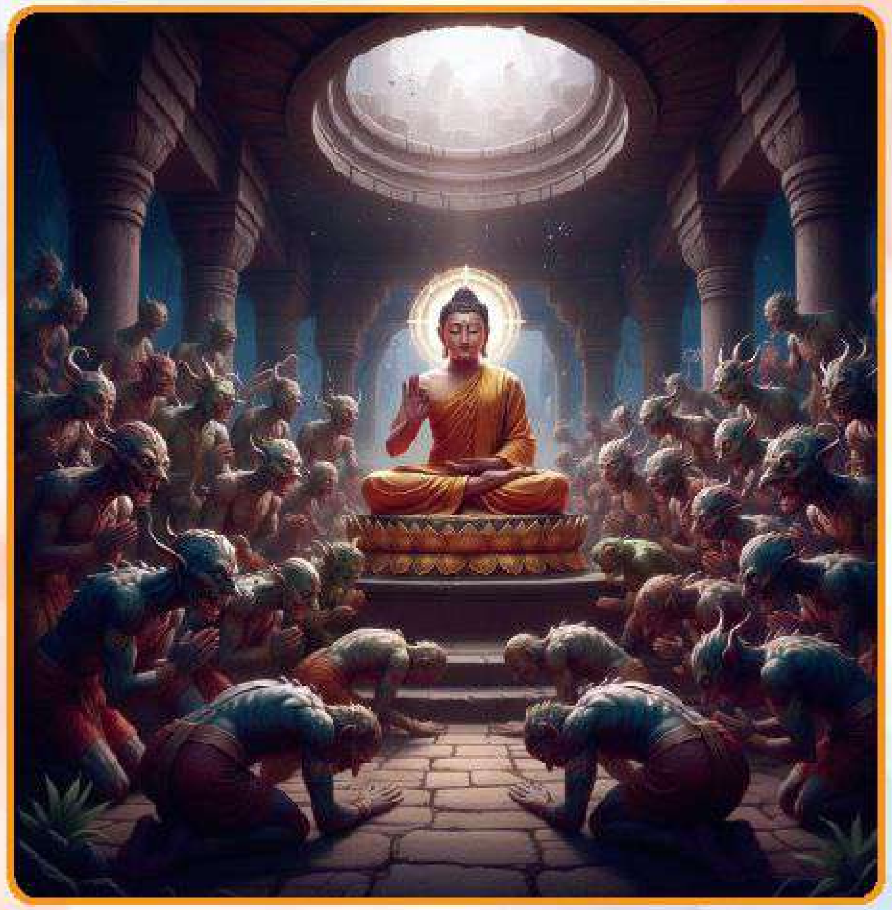

কাশ্যপ বুদ্ধের সামনে প্রার্থনারত বিম্বিসারের জ্ঞাতি প্রেতগণ

প্রাচীন বৈশালীনগরে বজ্জীদের বৈঠকের চিত্র

নৃত্যরত অপ্সরা সমতুল্য আম্রপালি